মুসলিম জাতিসত্তা

----------মোঃ মোস্তফা জামাল ভূইয়া, চেয়্যারমান , প্যান ইসলামিক মুভমেন্ট বাংলাদেশ

মোবাইল 01675-179168

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ০১

আমরা সবাই জানি যে, ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর পূর্ব ভারতে মুসলিম শাসনের অব ইসলামসান ঘটে। কিন্তু এই ঘটনার পূর্বে মুসলিম জাতিসত্তার বীজ বপন করা হয়। ১৭০৭ সালে মোগল সম্রাট আলমগীর ইন্তেকাল করার পর ভারতে মুসলিম শাসন দূর্বল হয়ে পড়ায় দক্ষিণ ভারতের মারাঠা শক্তি তাদের হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদেরকে গনহারে হত্যা শুরু করে। এমনকি নবাব সিরাজউদ্দৌলার পিতা জয়নুদ্দীন মোহাম্মদকে এই হিন্দুত্ববাদী মারাঠা শক্তি হত্যা করে। দিল্লিতে মোহাম্মদ শাহ সি্হাসনে আরোহণ করার পর মুসলিম শক্তির দ্রুত পতন শুরু হয় । বস্তুত মোগল সম্রাট মোহাম্মদ শাহ এর আমল হতেই ভারতীয় মুসলিম বিশেষ করে পূর্ব ভারত ও উত্তর ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্বের স্কট দেখা দেয়। এমতাবস্থায় হিন্দু শক্তির পাশাপাশি ইংরেজদের উখান ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব আরো বেশি স্কটে নিপতিত হয়। এদিকে এই ইংরেজরা ১৭৫৭ সালের আগেই দক্ষিণ ভারতের সুরাটের মুসলিম নবাবকে পরাজিত করে সেখানে পুতুল নবাব বসিয়েছেন। এই দিকে পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাবে শিখদের উখান শুরু হয় । এমতাবস্থায় ভারতীয় মুসলমান বিশেষ করে পূর্ব ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্বের স্কট প্রকট হয়ে উঠে। এহেন পরিস্থিতিতে ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। এই দিকে উত্তর ভারতের মুসলমানদেরকে হিন্দু শক্তির হাত হতে রক্ষার জন্য আহমেদ শাহ আবদালী ভারতে এসে ১৭৬৩ সালে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের পরাস্ত করে উত্তর ভারতের মুসলমানদেরকে সাময়িক ভাবে স্বস্তি দেয় , কিন্তু ১৭৬৫ সালের বক্সারের যুদ্ধে লৌখনীর নবাব পরাজিত হলে উত্তর ভারতের মুসলমানরা স্বাধীনতা হারায় । ১৭৫৭ ও ১৭৬৫ এই দুটি ঘটনা ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্বের স্কট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৭৫৭ সালের সূত্র ধরে সবচেয়ে বেশি অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয় বাংলার মুসলমানরা।

পাঠক, আজকের বাংলাদেশে শুধু জিয়াউর রহমান ও শেখ মুজিবুর রহমানকে নেতা হিসেবে পরিচিত করলেও তারা এদেশের মুসলমানদের ইতিহাসে একটি অতি সামান্য অংশ। এই দেশের অস্তিত্ব ধারাবাহিক ঘটনার মধ্য দিয়ে এসেছে। যদি এই ধারাবাহিক ঘটনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মুসলমানদের অস্তিত্বের স্গ্রাম বনাম মুসলমানদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচার, নির্যাতন এবং আগ্রাসনের ইতিহাস। পূর্ব ভারত বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার স্গ্রামের ফসল হল মুসলিম জাতিসত্তা বা মুসলিম জাতীয়তাবাদ। এই মুসলিম জাতিসত্তা অথবা মুসলিম জাতীয়তাবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ না করলে এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিলীন হবে। কাজেই মুসলিম জাতীয়তাবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা ব্যতীত এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার অন্য কোন উপায় নেই।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ০২

পাঠক, এই পর্বে আমি উম্মাহ, মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব। অনেকের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, উম্মাহ ও মূসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ উম্মাহর কনসেপ্ট এর সাথে সা্ঘর্ষিক । উম্মাহ ও মুসলিম জাতিসত্তার মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

পাঠক, উম্মাহর কনসেপ্ট সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য। কিন্তু মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ এক হাজার মুসলিম যদি উত্তর কোরিয়ায় বসবাস করে তারা উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে এই এক হাজার মুসলিম রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। যেখানে অমুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স্বায়ত্তশাসন অথবা রাষ্ট্র গঠনের পর্যায়ে উপনীত হয় তখন মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটে । উদাহরণ স্বরূপ ১৯০৫ সালের মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ গঠন, বর্তমানে ভারতের কাশ্মীরের অবস্থা সহ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে।

আবার মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে অনেক সময় রাষ্ট্র গঠিত হয় উদাহরণ স্বরূপ সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ এবং বসনিয়া। বর্তমান বাংলাদেশ স্ বিধান মোতাবেক সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের লিগ্যাসি বহন করে।

পাঠক, উম্মাহর কনসেপ্ট মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা ব্যাপক । উম্মাহর কনসেপ্ট কোন নির্দিষ্ট ভূ খন্ডে সীমিত নয় । মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ উম্মাহর অংশ, কারণ মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হয় তখন আপনি ঐ রাষ্ট্রকে উম্মাহ হতে খারিজ করার কোন সুযোগ নেই। আবার সৌদি আরবের ন্যায় গোত্র ভিত্তিক কোন রাষ্ট্র গঠন হলেও তাকে উম্মাহ হতে খারিজ করতে পারবেন না, আবার ভারতের মুসলমানদেরকে আপনি উম্মাহ হতে খারিজ করতে পারবেন না।

উম্মাহর কোন জনগোষ্ঠী যখন নিজেদেরকে অমুসলিম শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা করে তখন মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ বসনিয়া, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।

মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভূখণ্ড গত বিষয় , পক্ষান্তরে উম্মাহ কোন নির্দিষ্ট ভূ খন্ডগত বিষয় নয়। পাশাপাশি একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র থাকলে সেখানে উম্মাহ কনসেপ্ট কার্যকর, মুসলিম জাতিসত্তার বিষয়টি কার্যকর নয় । মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ একান্তই অমুসলিমদের আগ্রাসনের হাত হতে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটি চেতনা।

মুসলিম জাতিসত্তার বিষয়টি পৃথিবীর সব মুসলিম দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়, এটি বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও বসনিয়ার জন্য কঠোরভাবে প্রযোজ্য, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ ও ব্রনাই এর জন্য অবস্থানগত কারণে প্রযোজ্য ।

মুসলিম জাতিসত্তা অনেক সময় অমুসলিম শাষন অথবা অমুসলিম দেশে ও প্রযোজ্য হয়ে থাকে, উদাহরণ স্বরূপ ফিলিপাইনের মিন্দানাওয়ার মুসলিম, ভারতের কাশ্মীর, ১৯০৫ সালের মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ, দক্ষিণ থাইল্যান্ডের মুসলিম জনগোষ্ঠী ইত্যাদি।

মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ উম্মাহর সদস্যদের অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার। সাধারণত মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ মূল মুসলিম ভূখন্ড তথা রাষ্ট্রগুলো হতে বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড। উদাহরণ স্বরূপ বা্লাদেশ, মিন্দানাওয়া ।

মুসলিম জাতিসত্তা অথবা মুসলিম জাতীয়তাবাদ উম্মাহকে শক্তি শালী করে। উদাহরণ স্বরূপ বা্লাদেশ মুসলিম মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে মুসলিম ও ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিতে পারে।

পাঠক, সভ্যতার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখবেন যে একটি জনগোষ্ঠী যখন অপর একটি জনগোষ্ঠী দ্বারা অত্যাচারিত হয় এবং তাদেরকে নির্মূল করার চেষ্টা করে তখন সেই মজলুম জনগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটি সাধারণ পরিচয়ে পরিচিত হয়ে থাকে।।

বাংলাদেশের অস্তিত্ব রক্ষার গ্যারান্টার হল মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ। কারণ এদেশের ভিত্তি হল মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ । যদি মুসলিম জাতিসত্তা এদেশের মূল ভিত্তি না হত , তাহলে এই ভূখণ্ড ভারত অথবা বার্মার অংশ হত ।

আমি পরবর্তী পর্ব গুলোতে এই সম্পর্কে আরও আলোচনা করব। চলমান, তারিখ - ০৭.০৬.২০২৫ ইং।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ০৩

পাঠক, বিগত পর্বে আমি উম্মাহ এবং মুসলিম জাতিসত্তা এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পর্বে আমি উম্মাহর কনসেপ্ট কিভাবে মুসলমানদের অস্তিত্বের সহায়ক তা নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠক, উম্মাহর কনসেপ্ট মুসলমানদের সার্বিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য। আমি বিগত পর্বে আলোচনা করেছি যে, মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ মূল মুসলিম ভূখণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডের জন্য প্রযোজ্য। এই ভূখণ্ড গুলোকে রক্ষার জন্য মুসলিম জাতী সত্তা ও উম্মাহর কনসেপ্ট আবশ্যক। মুসলিম জাতিসত্তা আভ্যন্তরীণ স্হতির জন্য অপরিহার্য এবং উম্মাহর কনসেপ্ট আভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আবশ্যক। এই উম্মাহর ভিত্তিতে এক দেশের মুসলিমরা অন্য ভূখণ্ডের মুসলিমদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে ।

আমি উম্মাহ এর কনসেপ্ট কিভাবে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক তা নিয়ে আলোচনা করবো। ওমা তাওফিকি ইল্লাহ বিল্লাহ।

পাঠক, ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলে দেখতে পাবেন যে , কোন ভূখণ্ডের মুসলমানরা যখন অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয়েছে তখন উম্মাহ এগিয়ে এসেছে ।

খোলাফায়ে রাশেদীন হতে ১০৯৯ সাল পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ব পরাজয় অনুভব করেনি। ইসলামী শক্তি ১০৯৯ সাল পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। ১০৯৯ সালে ক্রুসেড এর মাধ্যমে ইসলামী শক্তি প্রথম পরাজয় অনুভব করে ।

১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা জেরুজালেম সহ সিরিয়ার বিশাল এলাকা দখল করে নিয়ে পাঁচটি রাজ্য স্থাপন করে। ক্রুসেডারদের বর্বরতার প্রতিরোধ করার জন্য বাগদাদের খলিফা সেলজূক সুলতানদের নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত সেলজুক সুলতানগন ক্রসেডারদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করে । ইতিহাসে আরো অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে যেখানে মুসলমানদের অস্তিত্বের বিষয়টি খোদ খলিফার অবদান ছিল।

এবার আসা যাক খলিফা ব্যতিত অন্যরা কিভাবে উম্মাহর কনসেপ্ট এর ভিত্তিতে এগিয়ে এসেছে।

১০৩০ সালে স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর সেখানে মুলকুত তাওয়ায়িফ অথাৎ ক্ষুদ্র রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের আগ্রাসনের মুখে পড়লে উত্তর আফ্রিকার মুয়াহিদ ও মুরাবিত শাসকগোষ্ঠী স্পেনে পদার্পণ করে মুসলমানদেরকে খ্রিস্টানদের আগ্রাসন হতে রক্ষা করা উম্মাহ কনসেপ্ট এর একটি উদাহরণ।

কায়রোর দূর্বল আব্বাসী খিলাফতের আমলে ইউরোপীয় শক্তি ইন্দোনেশিয়ার একাংশ গ্রাস করে নিলে উসমানীয় সূলতান সেলিম এক শক্তিশালী মুসলিম নৌ বাহিনী প্রেরণ করে মুসলমানদেরকে রক্ষা করে। এটি ছিল উম্মাহর কনসেপ্ট এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আবার ১৭০৭ সালে বাদশাহ আলমগীর এর ইন্তেকাল এর পর হিন্দুত্ববাদী শক্তির উত্থান ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়, এমতাবস্থায় গাজী আহমদ শাহ আবদালী আফগানিস্তান হতে ভারতে এসে মোগল ১৭৬৩ সালে পানি পথের যুদ্ধে হিন্দু শক্তিকে পরাস্ত করে মুসলমানদেরকে উদ্ধার করা উম্মাহ কনসেপ্ট এর উদাহরণ।

১৯৬৭ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধে পাকিস্তানের বৈমানিক গন আরব মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করা উম্মাহ কনসেপ্ট এর একটি উদাহরণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানরা অমুসলিমদের দ্বারা মজলুম হলে বায়তুল মোকাররমে মুসলমানদের যে মিছিল হয় এটি উম্মাহ কনসেপ্ট এর ফসল।

পাঠক, মুসলিম জাতিসত্তার কনসেপ্ট শুধুমাত্র মূল মুসলিম ভূখন্ড হতে বিচ্ছিন্ন ভূমি এবং অমুসলিম আগ্রাসন হতে মুসলিম ভূমির লাগোয়া কোন ভূখণ্ড বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। চলমান, তারিখ -০৮.০৬.২০২৫ ইং

মোঃ মোস্তফা জামাল ভূঁইয়া
চেয়ারম্যান
প্যান ইসলামিক মুভমেন্ট বাংলাদেশ।
মোবাইল - ০১৬৭৫-১৭৯১৬৮

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ০৪

পাঠক, এই পর্বে আমি খিলাফত, প্যান ইসলামিজম এবং মুসলিম জাতিত্তা সম্পর্কে আলোচনা করব। খোলাফায়ে রাশেদীন এর পর থেকে মো্গল আক্রমণের কয়েক বছর ব্যতিত ইসলামী শক্তি সারা পৃথিবীতে আঠারো শতক পর্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রাখে । এই সময় অষ্ট্রিয়ার দানিয়ূব নদীর পূর্ব তীর হতে বার্মার আরাকান পর্যন্ত এবং জিব্রাটা প্রনালী হতে চীনের উইঘুর পর্যন্ত ইসলামী সালতানাতের সীমানা ছিল। উসমানীয় খিলাফত তিনটি মহাদেশ জুড়ে তাদের শাসন ছিল । অতঃপর পারস্যের সাফাভী সাম্রাজ্য সীমানা আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিন্দু কুশ পর্বতের পাদদেশ থেকে বার্মা পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উসমানীয় খিলাফত দূর্বল হয়ে পড়ে , এদিকে ভারতে ১৮৫৭ সালে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং পারস্যের কাজার রাজব্শ সাফাভীদের জৌলুস হারিয়ে ফেলে। মুসলিম আমিরাত , সালতানাত একের পর এক অমুসলিমদের পদাতন হতে থাকে, এমতাবস্থায় সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানী নামক এক মনিষীর আবির্ভাব ঘটে যিনি উসমানীয় খলিফার অধীনে মুসলিম বিশ্বকে একত্রিত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

১৮৫৭ সালে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতীয় মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয়। ১৮৫৭ সালের পর সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানীকে ইংরেজরা কলকাতায় নির্বাসিত করলে সেখানে তিনি মুসলমানদের স্বাধীনতার বানী প্রচার করেন । এদিকে মুসলিম নেতারা তার নিকট প্যান ইসলামিজম এর দীক্ষা নেয় যার মধ্যে সোহরাওয়ার্দীর পিতা ও চাচা অন্যতম। বস্তুত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে খিলাফতের সাথে যোগসূত্র এবং মুসলিম জাতিসত্তা বিকাশের মধ্যমনি হলেন প্যান ইসলামিজম যার প্রবক্তা ছিলেন জামাল উদ্দিন আফগানী ।

এদিকে ১৮৮৬ সালে ভারতীয় ক্গ্রস গঠিত হলে সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদেরকে এর কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেন । এই হিসেবে ১৮৫৭ সালের পর মুসলিম জাতিসত্তার প্রবক্তা হয়ে উঠেন স্যার সৈয়দ আহমেদ। সৈয়দ আহমদ এর ইন্তেকালের পর মুসলিম জাতিসত্তার শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আলীগড়ে চলতে থাকে। মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যিনি নীরবে কাজ করেছেন তিনি হলেন মাওলানা আশরাফ আলী থানভী। যা হোক আশরাফ আলী থানভী সাহেব তার বন্ধু ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সাহেব এর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

বি্শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আলীগড়ের পাশাপাশি ঢাকাকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাতিসত্তার রাজনৈতিক বিকাশ শুরু হয় যার ফলে ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি মুসলিম প্রদেশ গঠন এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একটি মাইলফলক। অতঃপর ১৯২০ সালের খিলাফত আন্দোলন এবং ১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতিসত্তা ও প্যান ইসলামিজম এর ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠন অত্র এলাকার মুসলমানদের জন্য মেঘনা কার্টা। বস্তুত ১৮৫৭ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের খিলাফত, প্যান ইসলামিজম এবং মুসলিম জাতিসত্তা যথেষ্ট প্রভাব সৃষ্টি করে।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ০৫
ভারতীয় মুসলমানদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং মুসলিম জাতিসত্তার উখান ।

পাঠক, ৭১২ সালে মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু বিজয়ের পর পশ্চিম ভারত উমাইয়া খেলাফতের অধীনে আসে। ৭৫০ সালে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর তা আব্বাসী খেলাফতের অধীনে চলে যায়। মহান আব্বাসীগনের পর দূর্বল আব্বাসীদের আমলে তা কারামতী শিয়াদের অধীনে চলে যায়। অতঃপর গজনীর সূলতান মাহমুদ কারামতী শাসনের অবসান ঘটান ।

মুইজ উদ্দিন মোহাম্মদ ঘুরীর আগমন পর্যন্ত তা গজনী বেশর অধীনে ছিল। সূলতান ঘূরী দিল্লি দখলের পর সেখানে স্বতন্ত্র মুসলিম সালতানাতের যাত্রা শুরু হয় । সুলতান ঘুরীর পর হতে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত দিল্লি ও ভারতের অন্যান্য স্থানে স্বতন্ত্র মুসলিম সালতানাত গড়ে উঠে। এসব সালতানাত বাগদাদ অতঃপর কায়রোর আব্বাসী খলিফাদের অনুমোদিত ছিল।

এদিকে দিল্লি দখলের কিছু দিন পর ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলা বিজয় করেন এবং উনার ইন্তেকালের পর গিয়াসউদ্দিন উদ্দিন এওয়াজ খিলজী বাংলায় একটি স্বতন্ত্র সালতানাতের স্বীকৃতির জন্য বাগদাদে দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু দিল্লির সুলতানের বাহিনীর হাতে দূত ধরা পড়ার কারণে বাংলাকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিফলে যায়।

কিন্তু এর পর শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ আল সিস্তানী পূর্ব ভারতে একটি মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন যা ধারাবাহিক ভাবে ১৫৭৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।উল্লেখ্য যে, ইলিয়াস শাহী বংশের সূলতানকে উৎখাত করে বা্লায় রাজা গনেশ এর নেতৃত্বে হিন্দু শাষন শুরু হলে দরবেশ নূর কুতুব আলম এর আহবানে জৈনপুরের শারকী বেশর সূলতান ইব্রাহিম শারকী উম্মাহর চেতনায় বাংলার মুসলমানদের উদ্ধার করে। যা হোক পূর্ব ভারতের শেষ সূলতান সুলাইমান কররানি ঘোড়াঘাটের যুদ্ধে মোগল বাহিনীর হাতে পরাস্ত হবার পর বাংলায় সালতানাত যুগের অবসান ঘটে ।

মোগলদের পতন কালে মহিশুরের হযরত টিপু সুলতান উসমানী খলিফাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা স্গ্রামের সময় গোপনে কিছু স্বাধীনতা কামী খলিফার সাথে যোগাযোগ করেন।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর জামাল উদ্দিন আফগানীর কলকাতায় নির্বাসন এবং মুসলিম নেতাদের প্যান ইসলামিজমে দীক্ষা, তৎপর ১৮৮৬ সালে কেগ্রস গঠনের দূরভিসন্ধি বুঝতে পেরে স্যার সৈয়দ আহমেদ মুসলমানদের স্বতন্ত্র অবস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে , যার ফলশ্রুতিতে ১৯০৫ সালে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ, ১৯২০ সালের খেলাফত আন্দোলন এবং এর ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব। বস্তুত ১৮৫৭ সালের পর মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর খিলাফত, প্যান ইসলামিজম এবং মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ০৬

পাঠক, বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই অ্শ হল মুসলিম সালতানাতের সর্ব পূর্বে অবস্থিত। বস্তুতু এই বিশাল মুসলিম সালতানাতের পতন এই বা্লা হতে স্পষ্টভাবে শুরু হয়েছে।

১৭৫৭ সালের পর হতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পৌনে দুই শত বছর যাবত মুসলিম সালতানাত এবং এলাকাগুলো একের পর এক পরাধীন হতে থাকে, অবশেষে ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয়। ১৯২৪ সালে খিলাফতের পতনের পর মুসলমানরা বলতে পারত না যে, মুসলমানদের একটি দেশ আছে ।

পাঠক, এই ভূখণ্ড হতে মুসলমানদের পতন শুরু হয় এবং এই ভূখণ্ডেই আবার মুসলমানদের আজাদীর বীজ বপিত হয় । এই বীজ বপিত হয় মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে। আমি এই ব্যাপারে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করব।।

যা হোক, এবার ভারতীয় মুসলমানদের কথা আসা যাক । মুসলিম হিসেবে সারা পৃথিবীর মুসলিমরা একে অপরের ভাই। একজন ভাইয়ের পরিচয় তার বিপদে মিলে। এদিকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বেলায় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য যিনি আমৃতু্য লড়াই করেছেন তিনি হলেন শেরে মহিশুর হযরত টিপু সুলতান। এই টিপু সুলতান উসমানী খলিফার অনুগত ছিল। টিপু সুলতানের সাথে ঢাকার নিমতলীর নোয়াবে নাজিমের একটি অংশ ১৭৯৭ সালে গোপনে যোগাযোগ করে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন।

পাঠক, মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদ কোন বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। মুসলিম জাতিসত্তা হল এমন একটি অনুভূতি যা অমুসলিমদের আগ্রাসন হতে মূল ভূ খন্ড হতে বিচ্ছিন্ন মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করে।

খিলাফত এমন একটি ধারণা যেখানে মূসলমানদেরকে এক পতাকাতলে একত্রিত করে। কিন্তু আমরা বিগত কয়েক শতাব্দীর মুসলিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, যে সব এলাকা খিলাফতের অধীন ছিল না সেখানে উম্মাহর কনসেপ্ট মুসলমানদেরকে একত্র করেছে, যদিও খিলাফতের অধীনে থাকা আবশ্যক।

খিলাফতের ইতিহাসে দেখা যায় যে , ১২৫৮ সাল পর্যন্ত খলিফাগন মুসলমানদের অস্তিত্বের গ্যারান্টার ছিল এবং তিনিই ছিলেন মূসলমানদের অভিভাবক। বাগদাদের আব্বাসী খিলাফতের পতনের পর কায়রোর আব্বাসী খলিফাগন এই দায়িত্ব কমবেশী পালন করেছেন।

১৫১৭ সালে উসমানীয়দের হাতে খিলাফতের গুরূ দায়িত্ব অর্পিত হয় । উসমানীয় খলিফাগন তাদের এলাকার বাইরে ককেসাসের মুসলমানদের অভিভাবক ছিলেন। তাই দেখা যায় ক্রিমিয়ার খানাতের একটি চুক্তিতে রাশিয়ার জার সম্রাট উসমানীয় সূলতানকে মুসলমানদের খলিফা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ।

ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুসলমানরা মুসলিম জাতিসত্তার পতাকা তলে স্গ্রাম করেছেন।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতীয় মুসলমানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য খিলাফত, প্যান ইসলামিজম এবং মুসলিম জাতিসত্তার পতাকা তলে সমবেত হয়ে স্গ্রাম করেছে।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এদেশের মুসলমানদের জন্য খিলাফত, প্যান ইসলামিজম এবং মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক।এই পথ হল আমাদের পূর্ববর্তীদের পথ , পূর্ববর্তীদের পথ পরিহার করে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের থিওরির উপর চলার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের অস্তিত্বের স্কট দেখা দিয়েছে যা ভবিষ্যতে আরো প্রকঠ আকার ধারণ করবে।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ০৭

এই পর্বে আমি খেলাফতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ননা করব। খোলাফায়ে রাশেদীন এর পর উমাইয়া খেলাফত ৭৫০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৭৫০ সালে উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসীরা খেলাফত এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাগদাদের আব্বাসী খিলাফতকে শাসনকালের দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় , মহান আব্বাসী খলিফা যা মুতাসিম বিল্লাহ এর শাসনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতঃপর দূর্বল আব্বাসীদের শাসনকাল শুরু হয় যা ১২৫৮ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১২৫৮ সাল পর্যন্ত বাগদাদের আব্বাসীদের পতনের পর, ১৫১৭ সাল পর্যন্ত কায়রোর আব্বাসী খিলাফত কাল বিস্তৃত ছিল, ১৫১৭ সাল হতে ১৯২৪সাল পর্যন্ত উসমানীয় খিলাফত। এ গুলো হল মূল ধারার খিলাফত। স্পেনের উমাইয়া খেলাফতকে মূল ধারার খেলাফতের পরিপূরক হিসেবে গন্য করা হয়।

বিচ্ছিন্ন ধারার খেলাফত এর মধ্যে মিসরের ফাতেমী খিলাফত, মুরাবিদ খিলাফত, তিহারতের খারেজী আমিরাত তথা খারেজী খিলাফত আরো বিভিন্ন সময় কতক খিলাফত গড়ে উঠেছিল।

খোলাফায়ে রাশেদীন হতে ৭৫০ সাল পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম ভূমি একই খলিফার অধীনে পরিচালিত হত । ৭৫৪ সালে স্পেনে উমাইয়া আমিরাতের পত্তন হবার পর থেকে ৯২৭ সাল পর্যন্ত উমাইয়া আমীর গন নিজেদেরকে খলিফা দাবি করেন নি ।

ইতিমধ্যে আফ্রিকায় শিয়ারা ক্ষমতা দখল করলে এবং বাগদাদের আব্বাসী খিলাফত দূর্বল হবার কারণে ৯২৭ সালে স্পেনের উমাইয়ারা খিলাফত ঘোষণা করেন। এই খিলাফত ১০৩০ সাল পর্যন্ত সহায়ী ছিল। উল্লেখ্য যে, তখন মালেকী মাযহাবের ফকিহগনের ফতোয়া নিয়ে তারা রাজ্য শাসন করতেন এবং ঐ রাষ্ট্রের একটি শরয়ী স্বীকৃতি ছিল। বাগদাদের খলিফাগন তাদেরকে কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

এবার আসা যাক, আব্বাসী খিলাফত আমলে রাজ্যের শরয়ী বৈধতা। বস্তুত বাগদাদের আব্বাসী খিলাফত আমলে মিসরের তুলুনী আমীরাতের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসিত আমিরাত শুরু হয়। অতঃপর সামানী, গজনী , সেলজুক, মিসরের মামলুক , ভারতের মামলুক সহ অন্যান্য মুসলিম রাজ্যের শরয়ী বৈধতা খলিফার স্বীকৃতির উপর নির্ভর করত।

বাগদাদের আব্বাসী খিলাফত এর পতনের পর কায়রোর আব্বাসী খলিফাগন ও ১৪০২ সাল পর্যন্ত এই গুরু দায়িত্ব পালন করেন। ১৪০২ সালে উসমানীয় ও তুর্কী বারলাস গোত্রের তৈমুর লংয়ের মধ্যকার আংকুরার যুদ্ধের পর কায়রোর আব্বাসীদের অনুমোদন এর জুরিসডিকশন সীমিত হয়ে যায়।

তৈমূরীয় সামাজ্য কায়রোর দূর্বল আব্বাসীদের নিকট হতে স্বীকৃতি না নিলেও খলিফাদের অস্বীকার বা

অবহেলা করেন নি । আবার ভারতের মোগলরা উসমানীয় খিলাফতের স্বীকৃতি না নিলেও তাদের অবহেলা করেন নি বরং আ্কুরার যুদ্ধ ব্যতিত উসমানীয় ও তৈমুরীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে তেমন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি । ১৫১৭ সাল হতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত উসমানীয়রা খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৪ সালে খিলাফতের পতনের পর মুসলমানরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ০৮

পাঠক, আমি বিগত পর্বগুলোতে মুসলমানদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ধরে তূলেছি এই পর্বে বাংলার মুসলমানদের করুণ ইতিহাস ধরে তূলব এবং এই করুণ ইতিহাস বাংলার মুসলমানদেরকে মুসলিম জাতিসত্তার দিকে কিভাবে ধাবিত করেছে এর পটভূমি তূলে ধরব । ওমা তাওফিকী ইল্লাহ বিল্লাহ।

পাঠক, ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এর পতনের পর বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে নেমে আসে এক কালো মেঘ যা দুই শত বছর স্থায়ী ছিল। ১৭৫৭ সালে মুসলিম শক্তির পতন হয়েছে বিষয়টি সে সময় অনেকেই বুঝতে সক্ষম হয় নি। ১৭৬৫ সালে বকসারের যুদ্ধের পর দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব ভারতে মুসলিম শক্তির অস্তিত্ব নেই। ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা মোগল সম্রাট হতে দেওয়ানি লাভের পর শুরু হয় মুসলমানদের চূড়ান্ত পর্যায়ের পতন।

দেওয়ানী লাভের পর হতে জমির খাজনা বৃদ্বি করার দরুন চাষাবাদ হ্রাস পায় ফলে ১৭৭০ সালে এক দূর্ভিক্ষ দেখা দেয় যাতে শুবে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়। অতঃপর ইংরেজরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করার জন্য বিভিন্ন পলিসি গ্রহণ করে। অবশেষে ১৭৯৭ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ইংরেজরা এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করে যার নাম হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজরা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জমিদার নামক এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করে যাদের কাজ হল ভূমির খাজনা আদায় ও রাজনৈতিক ভাবে ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করা। এই মধ্যস্বত্বভোগীদেরকে হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষ করে উচ্চ বর্ণ হিন্দুদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হয়।

চিরসহায়ী বন্দোবস্তের পর মুসলমানরা ভূমির উপর তাদের অধিকার হারায় । ১৭৯৭ সাল হতে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ বাংলার মুসলমানরা গরীব হয়ে যায়। এই সময়ে আরো অনেক রাজনৈতিক ঘটনাবলী মুসলমানদের অস্তিত্বের স্কট দেখা দেয়, উদাহরণ স্বরূপ ১৮৩৭ সালে ফার্সিকে রাজকীয় ভাষা হতে বিলুপ্ত করে ইংরেজি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ফলে বহু মুসলমান বেকার হয়ে পড়ে ।

১৭৫৭ সাল হতে রাজনৈতিক অস্তিত্ব হারানোর পাশাপাশি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অস্তিত্ব শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। এই সময়ের মধ্যে মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি গুলো বাজেয়াপ্ত করার ফলে মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা শূন্যের কোটায় এসে পড়ে।

১৭৫৭ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যদি পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্যালোচনা করেন, তাহলে এত দীর্ঘ মেয়াদে এত অসহায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাবেন না। শুধু এই সময় নয় , ইসলামী

ইতিহাসের চৌদ্দ শত বছরের মধ্যে এত দীর্ঘ সময় ধরে অসহায় মুসলমানদের ইতিহাস খুজে পাওয়া যাবে না।

১৭৫৭ সাল হতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের ন্যায় বাংলার মুসলমানরাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ সময় ফকির বিদ্রোহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর সহ অসংখ্য বিদ্রোহ হয় যার নেতৃত্বে ছিল মুসলমানগণ। এই সময়ে মুসলমানরা আযাদী সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, আর হিন্দু জমিদাররা ব্রিটিশদের দালালী করে যৌথভাবে মুসলিম নিধনের কাজ করতেছিল ।

এদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারনে মুসলিম জনগোষ্ঠী ভূমিহীন হয়ে পড়ে, অপরদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণে ইংরেজদের রোষানলে নিপতিত হয়, অপরদিকে ইংরেজদের দালাল জমিদার শ্রেণী মুসলমানদের উপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত করে।

এই সময়ে জমিতে একচেটিয়া স্বত্ব ছিল জমিদারদের, জমিদারের ইচ্ছার উপর প্রজার জমির দখল বেদখল নির্ভর করত। বকেয়া খাজনার দায়ে যে কোন সময় নোটিশ এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া ব্যতিত হিন্দু জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের উচ্ছেদ করত ।

অনেক সময় হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের দাড়ির উপর কর আরোপ করত । হিন্দুদের পুজা পার্বনে অনেক সময় মুসলমানদেরকে চাদা দিতে বাধ্য করা হত। অনেক হিন্দু জমিদারদের বাড়ি দিয়ে যাতায়াত করার সময় মুসলমানদেরকে খালি পায়ে যেতে বাধ্য করা হত। হিন্দু সম্প্রদায়ের ধনাঢ্য লোকদের বাড়ি অতিক্রম করার সময় ছাতা উড়ানো নিষেধ ছিল। অনেক সময় হিন্দু নেতাদের অনুমতি নিয়ে মুসলমানদেরকে গরু কুরবানী দিতে হত।

মাওলানা মহিউদ্দীন খান সাহেব এর বয়ান মোতাবেক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধীতার কারণে ময়মনসিংহ শহরে কোন গরু কোরবানি করা হয় নি। পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মুসলিম জাতিসত্তার একনিষ্ঠ খাদেম আব্দুল মোনায়েম খান ১৯৩৭ সালে ময়মনসিংহ শহরে প্রথম গরু কুরবানী করেন। এছাড়া কোন মজলিসে হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদেরকে চেয়ারে বসতে দিত না। এমনকি মুসলিম ছাত্রদেরকে হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষকরা পিছনের টেবিলে বসতে বাধ্য করত।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ০৯

পাঠক, আমি বিগত পর্বে বাংলার মুসলমানদের করুণ ইতিহাস সি্ককপ্ত আকারে কিছুটা বর্ননা করেছি যাতে দেখা যায় যে, ১৭৫৭ সাল হতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কোন অস্তিত্ব ছিল না।

এই সময়ে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানদের আলোচনা করলে বুঝতে পারবেন যে, সেই সময়ে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কি করুন অবস্থা বিরাজ করছিল।

পাঠক, ১৭৫৭ সালে মুসলিম উম্মাহ তার সর্বোচ্চ আজাদী ও ভূ খন্ড দেখতে পায় । এই সময়ে উসমানীয় খিলাফতের অগ্রাভিযান থেমে যায়। ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে সেখানকার ধন সম্পদ লুটপাট করে ইউরোপে পাচার করলে ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠে। ইউরোপের খ্রিস্টান সম্প্রদায় ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টান এই দুই দলে বিভক্ত থাকলেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল এক ।

এদিকে রাশিয়ার জার সাম্রাজ্য ককেসাশের মুসলিম এলাকাগুলো একের পর এক গ্রাস করে নেয়। ইন্দোনেশিয়া , মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনের মরো মুসলিম সালতানাতগুলো খ্রিস্টানদের পদানত হয় । এদিকে আফ্রিকার মুসলিম এলাকাগুলো একের পর এক ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের পদানত হতে থাকে।

এদিকে উসমানীয় সামরিক বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক জানেসারী বাহিনী বিলুপ্ত করার পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপের বিশাল এলাকা হাত ছাড়া হয়ে যায়।
এদিকে ইরানে সাফাভী সাম্রাজ্যের পতনের পর কাজার বৃশীয়রা ইরানের জৌলুস হারিয়ে ফেলে।

এদিকে মহিশুরের হযরত টিপু সুলতানের শাহাদাত বরণ করলে ভারতীয় মুসলমানদের স্বাধীনতার আকা্খা অনেকটা দমিত হয়ে যায়। ১৮০২ সালে দিল্লিতে ইংরেজ শক্তির উপস্থিতি ভারতীয় মুসলিমদের হতাশ করে। এই পশ্চিম ভারতের মুসলিম আমীরাতগুলো ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এদিকে হিন্দু শক্তি ও ইংরেজ শক্তির পাশাপাশি শিখদের উত্থান ভারতীয় মুসলমানদের আরো বেশি আতি্কত করে।

ভারতীয় মুসলমানদের এহেন অবস্থায় উলামায়ে কেরাম এগিয়ে আসেন যার নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ আহমদ রায় বেরলভী , উনি ১৮৩১ সালে বালাকোটে শাহাদাত বরণ করলে মুসলমানরা চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়ে ।

এমনি এক পরিস্থিতিতে ১৮৫৭ সালে জে্গ আজাদী শুরু হলে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে। এই যুদ্ধে মুসলিম শক্তির চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয় এবং মুসলমানরা ব্যাপক গণহত্যার শিকার হয় । সিপাহী বিপ্লবের মূল নায়ক মাওলানা আহমদ উল্লাহ এক জন হিন্দু জমিদারের ষড়যন্ত্রের ফলে শাহাদাত বরণ করেন, এদিকে উত্তর প্রদেশের হাসরত মহলের নেপালে আশ্রয় গ্রহণ, মধ্য ভারতের ইংরেজ বিরোধী মারাঠা শক্তির আত্মসমর্পণ, সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর এর নির্বাসন ইত্যাদি ঘটনাবলী মুসলিম রিয়াসাত

পুনরুদ্ধার করার আশা সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১৮৫৭ সালে আজাদী সংগ্রামের ব্যার্থতা ভারতীয় মুসলিম বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে অমাবস্যার রজনী নেমে আসে। ১৮৫৭ সালে মহা স্গ্রামের সময় কলকাতা কেন্দ্রীক হিন্দু সম্প্রদায় সরাসরি ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করে মুসলমানদের হয়রানি করা শুরু করে।

এই হল মুসলিম বিশ্ব, ভারতীয় মুসলিম এবং বাংলার মুসলমানদের অবস্থা।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ১০

পাঠক, আমি বিগত দুটি পর্বে ১৭৫৭ সাল হতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব, ভারতীয় মুসলিম বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পর্বে ১৮৫৭ সাল হতে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মুসলমানদের কেন্দ্রীয় শক্তি উসমানীয় খিলাফত ও ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচনা করব।

১৮৫৭ সালের আজাদী সংগ্রামের পর ভারতীয় মুসলমানরা রাজনৈতিক অস্তিত্ব হারিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত, এদিকে আফগানিস্তানে ইংরেজদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। উসমানীয় খিলাফতকে ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি হিসেবে গন্য করা হয় । ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর উসমানীয় খিলাফত ছিল মুসলমানদের একমাত্র আশা ভরসার স্থল। কিন্তু উসমানীয় খিলাফত ধীরে ধীরে তার ইউরোপীয় এলাকাগুলো হারাতে থাকে। বলকান এলাকা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট তৈরিতে ব্যস্ত। ইরানের কাজার বাদশাহ তার নিজ রাজ্যের অস্তিত্ব নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

উসমানীয় খিলাফতের এলাকাগুলো ব্যতিত সমগ্র মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো অমুসলিম শক্তির পদানত । এমতাবস্থায় সৈয়দ জামাল উদ্দিন আসাদাবাদী আল আফগানী নামক এক মুসলিম নেতার আবির্ভাব মুসলিম বিশ্বকে নতুন করে দাঁড়াতে সহায়তা করে।

সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানী উসমানীয় খিলাফত এর অধীনে মুসলিম বিশ্বকে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী খিলাফত প্রতিষ্ঠার পক্ষের প্রবক্তা ছিলেন। বস্তুত তার এই মিশনকে প্যান ইসলামিক মুভমেন্ট নামে অভিহিত করা হয়।

১৮৫৭ সালের পর সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানীকে কলকাতায় নির্বাসিত করলে পর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পিতা, চাচা সহ আরো অনেকে প্যান ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন । বস্তুত ১৮৫৭ সালের পর থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় প্যান ইসলামিক মুভমেন্ট এর শক্তিশালী প্রচার প্রচারণা হয় ।

উসমানীয় খলিফা সূলতান আব্দুল হামিদ তখন উসমানীয় খেলাফতের সাময়িক পতন রোধ করেন । এদিকে ১৮৯৭ সালে মুসলিম বিরোধী জায়নিজম শক্তির উত্থান হয় । সূলতান আব্দুল হামিদ অমুসলিম শক্তির চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি।

এদিকে ককেশাস অঞ্চলের মুসলমানরা রাশিয়ার জারদের করদ রাজ্য ও সরাসরি শাষনে চলতে থাকে। আফ্রিকার মুসলিম এলাকায় ইউরোপীয় শক্তির দিন দিন উপস্থিতি বাড়তে থাকে। অথাৎ মুসলিম বিশ্ব এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, একে অপরকে সহায়তা করার কোন অবস্থা ছিল না।

এসময় খিলাফত ও প্যান ইসলামিজম এর আদর্শ মুসলমানদের শুধু মাত্র মানসিকভাবে একত্রিত করতে সহায়তা করে। বস্তুত মুসলিম বিশ্বকে একত্রিত করার বাস্তবিক অবস্থা ছিল না।

কাজেই মুসলমানরা ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত খেলাফত ও প্যান ইসলামিজমকে অন্তরে লালন করতে থাকে এবং নিজেদের অস্তিত্বের জন্য নিজেরাই স্‌গ্রাম চালাতে থাকে। এই স্‌গ্রাম মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য সহায়ক ছিল যা পরবর্তীতে মুসলিম দেশ গুলোর স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।

আমি আগামী পর্বে ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচনা করব।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ১১

পাঠক, বিগত পর্বে আমি ১৮৫৭ সাল হতে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পর্বে ১৮৫৮ সাল হতে ১৯০৫ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠক, ১৮৫৭ সালের আজাদী সংগ্রাম ব্যার্থ হবার পর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে আসে। এই সময় ভারতীয় মুসলমানদের মনে তিন জন মহান ব্যক্তি আশা সনচার করেন । একজন হলেন প্যান ইসলামিজম এর প্রবক্তা সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানী, উত্তর প্রদেশের স্যার সৈয়দ আহমেদ এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানূতুবী ।

সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানীকে কলকাতায় নির্বাসন দিলে তিনি সেখানে স্বাধীনতার বানী প্রচার করেন। তিনি প্যান ইসলামিজম এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বাংলার অনেক মুসলিম নেতা প্যান ইসলামিজমের দীক্ষা গ্রহণ করেন। অপরদিকে উসমানীয় খিলাফতের প্রতি ভারতীয় মুসলমানরা পূর্বের তুলনায় বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে। মুসলমানরা খেলাফত তথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করে।

এদিকে স্যার সৈয়দ আহমেদ বাস্তবতার নিরিখে আলীগড় আন্দোলন শুরু করেন। আলীগড় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজকার্যে নিয়োজিত হয়ে মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত করেন। কারণ ১৮৫৭ সালের পর ভারতে মুসলিম সালতানাত পূন প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন ভূ লুণ্ঠিত হয় । এই অবস্থায় ইংরেজদের প্রশাসনে মুসলমানদের অস্তিত্ব না থাকলে হিন্দু শক্তি ইংরেজদের সহায়তায় মুসলমানদের আরও ক্ষতিগ্রসহ করার সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । বস্তুত স্যার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন ভারতে মুসলমানদের স্বতন্ত্রতার প্রবক্তা যা মুসলিম জাতিসত্তার জন্ম দেয়।

এদিকে দেওবন্দ মাদ্রাসা কেন্দ্রীক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা দিল্লির জামেয়া রহিমীয়ার শূন্য স্থান কিছুটা হলেও পূরন করে। দেও বন্দ মাদ্রাসার মাওলানা আশরাফ আলী থানভী মুসলমানদের লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম তাহযীব তামাদ্দুন জাগিয়ে তুলতে শুরু করেন। তিনি নীরবে মুসলমানদের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেন। ১৮৮৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলে সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে এই কে্গ্রসে যোগদান হতে বিরত থাকার জন্য আহবান জানান। ফলে মুসলমানরা মুসলমানরা পৃথক একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য গোপনে চেষ্টা করতে থাকে।

এদিকে হায়দরাবাদ , ভূপাল, জুনাগড়ের ন্যায় মুসলিম দেশীয় রাজ্যগুলো নিজ নিজ রাজ্যের বাইরে তেমন কিছু করার সুযোগ ছিল না।

এমনি ভাবে ১৮৫৮ সাল হতে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে খিলাফত, প্যান ইসলামিজম এবং মুসলিম জাতিসত্তার আওয়াজ বুলন্দ হতে থাকে। এই তিনটি ধারনা এই সময় ভারতীয় মুসলমানদের মনোজগতে একাকার হয়ে যায়।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ১২

পাঠক, বিগত পর্বে আমি ১৮৫৮ সাল হতে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করেছি । এই পর্বে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা বর্ননা করব

১৭৫৭ সাল হতে ১৮৫৭ সালের আজাদী সংগ্রাম পর্যন্ত বাংলার মুসলমানরা স্বাধীনতা উদ্বারে ব্যাস্ত ছিল। ১৮৫৭ সালের পর চরম হতাশা নেমে আসে। এই সময় বা্লায় কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল না। বাংলায় কোন রাজনৈতিক নেতৃত্ব না থাকলেও ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে মুসলমানরা আবার জেগে উঠতে শুরু করে। ঢাকার নবাব পরিবার তখনো সামাজিক নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে ফুরফুরা ও জৈনপুরের পীর সাহেবগনের নাম উল্লেখযোগ্য। উনারা তালিম ও তারবিয়্যাতের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ শুরু হয়।

রাজনৈতিকভাবে প্যান ইসলামিজম এর প্রবক্তা আল্লামা জাহিদ সোহরাওয়ার্দী, আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী এর নাম উল্লেখযোগ্য। পুরাতন ঢাকার নজরুল কলেজ তৎকালীন মহসিনীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে আল্লামা জাহিদ সোহরাওয়ার্দী প্যান ইসলামিজম এর প্রচার শুরু করেন এবং এই প্যান ইসলামিক ধারণা সোহরাওয়ার্দীর নানা আল্লামা উবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী ও পিতা আল্লামা জাহিদ সোহরাওয়ার্দীর মাধ্যমে পূর্ব বাংলা ও আসামে বিস্তার লাভ করে। খেলাফত, প্যান ইসলামিজম এবং মুসলিম জাতিসত্তার ব্যাপারে পুরাতন ঢাকার নারিন্দার পীর সাহেব ছিলেন একজন নিবেদিত কর্মী।

অপরদিকে পুরাতন ঢাকার নবাব পরিবার ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে নবাব সলিমুল্লাহ এর হাতে এই নেতৃত্ব পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। নবাব সলিমুল্লাহ এর উপর দেওবন্দী ধারার আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। বস্তুত সৈয়দ আহমদ , মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এবং আল্লামা জাহিদ সোহরাওয়ার্দী বাংলায় মুসলিম জাতিসত্তার চেতনা বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করেন।

এই সময়ে ঢাকার নবাব পরিবারের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক শক্তি গড়ে উঠতে থাকে । ফলে ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট পূর্ব বাংলা ও আসাম নামক একটি প্রদেশ গঠিত হয়।

বস্তুত ১৯০৫ সালের পূর্ব বাংলা ও আসামের আলাদা একটি প্রদেশ গঠন ১৭৫৭ সালের পর ভারতীয় মুসলমানদের প্রথম বিজয় । ১৯০৫ সালের সূত্র ধরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আবার রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়। তাই ১৯০৫ সাল হল বর্তমান বাংলাদেশের মূল ভিত্তি।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ১৩

পাঠক, বিগত পর্বে এই পর্বে আমি বাংলার মুসলমানদের করুণ অর্থনৈতিক অবস্থা কিভাবে মুসলিম জাতিসত্তার চেতনা বিকাশ ঘটে এই সম্পর্কে আলোচনা করব।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্রিটিশরা মুসলমানদেরকে পথের ফকির বানিয়ে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের হর্তাকর্তা বানিয়ে ফেলে । এই দ্বৈত শাষনের ফলে মুসলমানরা দিন দিন নির্যাতিত ও নিগৃহীত হতে থাকে। মুসলিম দেওয়ানগন তাদের সহায় সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়।

বস্তুত ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত পূর্ব ভারত বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলমানরা একটি ধনী শ্রেণী হতে ফকির শ্রেণীতে রুপান্তরিত হয়।

১৮৮৫ সালে বগীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হবার আগ পর্যন্ত মুসলমানরা ছিল যাযাবর , অথাৎ প্রজা হিসেবে হিন্দু জমিদাররা যে কোন সময় মুসলিম প্রজাকে জমি হতে উচ্ছেদ করার অধিকারী ছিল। ব্রিটিশদের আনুকূল্য পেয়ে হিন্দু জমিদাররা সভ্যতার দ্বন্দ্ব থিওরি ষোল আনা বাস্তবায়ন করে।

১৮৮৫ সালের বগীয় প্রজাস্বত্ব আইন মুসলমানদের কিছুটা স্বস্তি দেয় । বস্তুত মুসলমানরা সেই সময় হতেই মুসলিম জাতিসত্তার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে

পাঠক, ১৮৮৫ সালে বগীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হবার মুসলমানদেরকে জমিদাররা ইচ্ছে করলেই উচ্ছেদ করা বন্ধ হয় । মুসলমানরা তখন কিছু ভূ সম্পত্তির মালিক হতে শুরু করেছে। ১৮৮৫ সালের আইনের ফলে প্রজাদের নিন্মসহ স্বত্ব স্বীকৃতি দেয়ার পর মুসলমানদের মনে স্বস্তি আসে ।

পাঠক, ১৮৮৫ সালে মুসলমানরা জমিতে তাদের হারানো অধিকার কিছুটা ফেরৎ পায় । এই সময় পূর্ব বাংলার মুসলমানগণের মধ্যে কিছুটা গ্রামীণ ও শহুরে পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে উঠে ।

পাঠক, ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময়ে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার এবং ব্রিটিশ শাসন এই দ্বৈত শাসনের ফলে মুসলমানরা অমানবিক জীবন যাপন করেছে ।

১৮৮৫ সালে বগীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হবার পর শুরু হয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব। এই আইন পাশ হবার পর হিন্দু জমিদারদের স্বার্থ অনেকটা হ্রাস পায় ।
১৮৮৫ সাল হতে ১৯০৫ পর্যন্ত হিন্দু জমিদারদের সাথে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের মুসলমানদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন ঢাকার নবাব পরিবার। বস্তুত ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা দ্বৈত শাষন হতে কিছুটা মুক্তি পায় এবং বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের মুসলিম জাতিসত্তার পথ উন্মুক্ত হয় , যার সূত্র ধরে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক

উখান শুরু হয়। কাজেই ১৯০৫ সালকে অস্বীকার করলে বাংলাদেশের লিগ্যাসি বলতে কিছুই থাকে না এবং ভারতীয় আগ্রাসনের দুয়ার উম্মুক্ত হবে।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ১৪

পাঠক, ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতীয় মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ১৮৫৭ সালের পর মুসলমানদের করনীয় নির্ধারণে দুই জন ব্যাক্তি এগিয়ে এলেন, একজন হলেন আলীগড় আন্দোলনের স্যার সৈয়দ আহমেদ এবং দেওবন্দ আন্দোলনের মাওলানা কাসেম নানুতুবী । এই উভয় আন্দোলন ছিল শিক্ষাকেন্দ্রীক । ১৮৮৬ সালে ভারতীয় কে্গ্রস গঠিত হলে আলীগড় আন্দোলন শিক্ষা কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজনৈতিক অ্গনে প্রবেশ করে। এদিকে দেওবন্দ কেন্দ্রীক শিক্ষা ধারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর হাত ধরে প্রক্যাশে রাজনৈতিক ময়দানে হাজির হয় । ইতিপূর্বে আরেক দেওবন্দী আলেম মাওলানা আশরাফ আলী থানভী মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দীর আগ হইতে নীরবে রাজনৈতিক ভাবে মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য ঢাকার নবাব পরিবার সহ ভারতের অন্যান্য মুসলিম নেতাদের প্রভাবিত করতে থাকে। বস্তুত ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম জাতিসত্তা ভিত্তিক রাজনীতির উখানে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এর নীরবে সমর্থন ছিল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৫ সালে ব্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করলে ভূমির মালিকানায় কৃষকদের স্বত্ব স্বীকৃতি লাভ করে।

১৮৮৫ সাল হত ১৯০৫ এই সময়ে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনোজগতে এক বিপ্লবী চিন্তা বাসা বাঁধে। এদিকে আলীগড় আন্দোলনের প্রভাব অপরদিকে জমিতে মুসলমানদের অধিকার সীমিত আকারে ফেরৎ এই দুইটি মুসলমানদেরকে আত্ববিশ্বাসী করে তোলে।

এই বিশ বছরের মধ্যে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। অবশ্য অনেক স্থানে মুসলমানরা প্রতিরোধ করে ব্যর্থ হয়েছে এবং অন্য স্থানে হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে , এমন বেশ কিছু মুসলিম নেতৃসহানীয় পরিবারের সাথে লেখকের পরিচয় রয়েছে। এই সব পরিবার ঢাকার নবাব পরিবারকে মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণের দিকে উৎসাহিত করে।

১৮৮৫ সাল হত ১৯০৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মুসলমানদের সাথে হিন্দু জমিদারদের স্বার্থ ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। অনেক হিন্দু জমিদার মুসলমানদের দাড়ি রাখার উপর কর আরোপ করেছিল।

১৮৬২ সালের ভূমি সংস্কার আইন, ১৮৮৫ সালের ব্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন, আলীগড় আন্দোলন, সৈয়দ

আহমদ এর মুসলমানদের স্বতন্ত্র অবস্থান এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ এর উৎসাহ, ঢাকার নবাব পরিবারের যোগ্য নেতৃত্ব পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে, যার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি হল ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ।

এই মুসলিম জাতিসত্তার জন্য সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের দাবীদার ঢাকার নবাব পরিবার এবং এই পরিবারের সন্তান নবাব সলিমুল্লাহ ।

পাঠক, ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ হল এমন একটি ঘটনা যা ভারতীয় মুসলমানদের মাইল ফলক। ১৯০৫ সালের সূত্র ধরে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন দুটি এক সূত্রে গাঁথা।

পাঠক, আপনি লক্ষ্য করুন যে, যে বাংলার মাটিতে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিম রিয়াসাতের পতন হয়েছিল এবং পর্যায়ক্রমে সারা ভারত হতে মুসলিম রিয়াসাতের পতন হয় সেই বাংলাকে কেন্দ্র করে আবার ভারতীয় মুসলমানরা তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন করে।

পাঠক, আপনি আরো লক্ষ্য করবেন যে, পলাশীর যুদ্ধের ষড়যন্ত্র এই ঢাকায় করা হয়েছিল, সেই ঢাকাকে আবার কেন্দ্র করে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে বে্গল আসাম প্রদেশ গঠন, তৎপর ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন এবং এর পরবর্তী ইতিহাস মুসলমানদের রিয়াসাত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। কাজেই ১৯০৫ সাল হল এদেশের ভিত্তি মূল

পাঠক, ১৭৫৭ সাল হতে ১৭৯৭ সাল পর্যন্ত মুসলমানরা ব্রিটিশদের একক গোলাম ছিল। ১৭৯৩ সাল হতে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত বাংলার মুসলমানরা দ্বৈত শাষনে নিষ্পত্তিত হয়ে যায়, অধিকাংশ মুসলমানদের পরিধেয় বস্ত্র টুকুও ছিল না। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলার মুসলমানদের প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ ছিল না। ১৮৮৫ হতে ১৯০৫ পর্যন্ত স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সভ্যতার দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে, ফলশ্রুতিতে ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্টতার ভিত্তিতে একটি প্রদেশ গঠিত হয় যাতে কলকাতা কেন্দ্রীক হিন্দু শক্তির হাত থেকে মুসলমানরা মুক্তি পেতে পারে।

মুসলিম জাতিসত্তার ঐতিহাসিক পটভূমি ১৫

স্বাধীন মুসলিম রিয়াসাতের জন্য মুসলিম জাতীয়তাবাদের আবশ্যকতা।

পাঠক, একজন মুসলমান হিসেবে আমি খেলাফতে বিশ্বাসী। খেলাফতের অনুস্্গ হল প্যান ইসলামিজম যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বি্শ শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯২৪ সালে খেলাফতের পতনের পর প্যান ইসলামিজম ধারনাটি মুসলমানদের স্হতি রক্ষার উপায় হয়ে উঠে। অতঃপর বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্যান ইসলামিজম এর অনুস্গ হিসেবে মুসলিম জাতীয়তাবাদের আওয়াজ বুলন্দ হতে থাকে। এই প্যান ইসলামিজম এবং এর অনুস্গ মুসলিম জাতীয়তাবাদের ফসল হল ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র যা মুসলমানদের জন্য মিনি খিলাফত ছিল।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত হলে ও উভয় পাকিস্তানে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিপরীতে বাংগালী জাতীয়তাবাদ এবং সেক্যুলার ভিত্তিক সিন্দী, পাঞ্জাবি, বেলুচী ইত্যাদি জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি ইসলামী আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং যার ফলে ১৯৭১ সালে এর পতন হয়।

পাঠক, বর্তমান বিশ্বে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও বসনিয়া এই তিনটি রাষ্ট্র মুসলিম জাতিসত্তা তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, মালদ্বীপ এই চারটি রাষ্ট্র হল ভৌগলিক মুসলিম রাষ্ট্র। এই কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র ব্যতিত অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ভিত্তি খিলাফত, প্যান ইসলামিজম অথবা মুসলিম জাতীয়তাবাদ উপর নয় এবং এই তিনটি কনসেপ্ট এর সাথে কোন যোগসূত্র নেই। বর্তমানে আফগানিস্তান আছাবিয়্যাত ভিত্তিক রাষ্ট্র হতে শরীয়া রাষ্ট্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

পাঠক, বাংলাদেশ হল হিন্দু সভ্যতা ও বৌদ্ধ সভ্যতার সাথে দ্বন্দ্বে বিজয়ী ইসলামী সভ্যতা যা ১৯০৫ সালে ব্গভে্গর মাধ্যমে প্রমাণিত। কারণ ১৯০৫ সালে বৌদ্ধ সভ্যতার দেশ বার্মা ব্রিটিশদের অধীনে ছিল আবার ভারত ও ব্রিটিশদের অধীনে ছিল। এমতাবস্থায় মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বাংলা ও আসামকে নিয়ে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন প্রমাণ করে যে, তিনটি সভ্যতার দ্বন্দ্বে বিজয়ী ইসলামী সভ্যতার দেশ হল বাংলাদেশ। যা হোক, ১৯১১ সালে মুসলিম জাতিসত্তা সাময়িক ভাবে হোঁচট খেলেও ১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন মুসলিম রিয়াসাত গঠিত হয়।

এই মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠার কিছু দিন পর মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিপরীতে পূর্ব পাকিস্তানে জাহেলি যুগের ভাষা ভিত্তিক ও পশ্চিম পাকিস্তানে এলাকা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত এর উত্থান ঘটে , যার ফলে ইসলামী স্হতি নষ্ট হয়ে যায়।

পাঠক, আপনি যেভাবেই বিশ্লেষণ করেন না কেন, একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে বাংলাদেশ নামক মূল ভিত্তি হল মুসলিম জাতিসত্তা যা ১৯০৫ সালে ব্গভে্গর মাধ্যমে প্রমাণিত এবং ১৯৪৭ সালে

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ছিল প্যান ইসলামিজম এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের ফসল । বাংলাদেশ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগলিক লিগ্যাসি বহন করে যা বাংলাদেশের স্ বিধান দ্বারা স্বীকৃত। যে ভৌগল মুসলিম জাতীয়তাবাদের ফসল এবং যেই ভৌগলের লিগ্যাসি বাংলাদেশ বহন করে তা হল মুসলিম জাতীয়তাবাদ , কাজেই মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত ভৌগলে আপনি যদি মুসলিম জাতীয়তাবাদকে অবহেলা বা অস্বীকার করেন তাহলে আপনি আপনার অজান্তেই ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে নিজের পেটে নিজে ছুরি মারলেন।

যে ভৌগল বা দেশের মূল এবং একমাত্র উপাদান হল মুসলিম জাতীয়তাবাদ সেখানে আপনি মুসলিম জাতীয়তাবাদকে যদি পরিত্যাগ করেন তাহলে এই ভৌগল বা দেশের অস্তিত্ব থাকবে না। ১৯৭১ সালের পর থেকে আমরা তাই দেখে আসতেছি । যখনই মুসলিম জাতীয়তাবাদ বিরোধীরা এদেশের ক্ষমতায় আসে তখন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অমুসলিম দেশের পদতলে সমর্পিত হয় ।

পাঠক, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে গেছে এর অর্থ এই নয় যে, এই দেশের মুসলমানদেরকে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করতে হবে। আপনি যদি নিশাপুরের সেলজুক ও রোম সেলজুকদের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে নিশাপুরের সেলজুক হতে রোম সেলজুকরা এক যুদ্ধের মাধ্যমে আলাদা হলেও তারা ইসলামী আদর্শ পরিত্যাগ করে নি , বরং রোম সেলজুকরা খ্রিস্টান বাইজান্টাইনদের মোকাবেলায় ইসলামী আদর্শকে আরো গভীরভাবে আকড়ে ধরেছিল , উসমানীয় সালতানাত এই রোম সেলজুকদের লিগ্যাসি বহন করত ।

পাঠক, বাংলাদেশ একটি মুসলিম রিয়াসাত যার মূল ভিত্তি হল মুসলিম জাতীয়তাবাদ। এই মুসলিম রিয়াসাতকে স্বাধীন রাখতে হলে মুসলিম জাতীয়তাবাদ অপরিহার্য । আপনি যদি মুসলিম জাতীয়তাবাদ পরিত্যাগ করেন তাহলে আপনাকে হায়দরাবাদ ও কাশ্মীরের পরিনতি বরন করতে হবে। কাজেই বাংলাদেশ নামক একটি মুসলিম রিয়াসাতের স্বাধীনতার জন্য মুসলিম জাতীয়তাবাদ অপরিহার্য।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ০১.

পাঠক, এই পর্বে আমি জাতীসত্তা (Nat i onhood), জাতীয়তা (Nat i onal i t y) এবং জাতীয়তাবাদ (Nat i onal i sm) সম্পর্কে আলোচনা করব। কারন এই সব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে আপনি মুসলিম জাতিসত্তার স্বরূপ এবং এর ভিত্তিতে গঠিত বাংলাদেশের ভিত্তি মূল ১৯০৫ সাল সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবেন ।

জাতীসত্তা (Nat i onhood) হল এমন একটি অনুভূতি যা কোন জনগোষ্ঠীকে আত্মরক্ষা সহ নিজেদের স্বার্থ, অস্তিত্ব সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে নেয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ যা জাতি সত্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফিলিপাইনের মরো মুসলমানগণ দীর্ঘ লড়াইয়ের পর মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করে।

জাতীয়তাবাদ হল যে চেতনার ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র গঠিত হয় যেমন ১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা।

জাতীয়তা হল রাষ্ট্র গঠনের পর রাষ্ট্রের সব ধরনের নাগরিকদের সাধারণ পরিচিতি। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪৭ সালে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ সবাই পাকিস্তানী ।

জাতীসত্বা অনেক সময় রাষ্ট্র গঠনের মূল নেয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে, উদাহরণ স্বরূপ ১৯০৫ সালে মুসলিম জাতিসত্তা পরবর্তী কালে মুসলিম জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠন করে।

বর্তমানে ভারতের কাশ্মীর জাতিসত্তার ভিত্তিতে চলছে, যখন রাষ্ট্র গঠনের দিকে যাবে তখন এটি অবশ্যই মুসলিম জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হবে।

বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলোতে সমাজতান্ত্রিক শক্তির পতন হয়। অতঃপর বসনিয়া প্রথমে মুসলিম জাতিসত্তার জন্য গণহত্যার শিকার হয় এবং তা মুসলিম জাতীয়তাবাদের দিকে মোড় নেয়।

মুসলিম জাতিসত্তা হল অমুসলিমদের আগ্রাসন হতে কোন মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষা করাকে বুঝায়।

মুসলিম জাতিসত্তা উম্মাহ কনসেপ্ট এর সহযোগী কনসেপ্ট , কারণ দারুল খেলাফত এর এলাকার বাইরে অন্যত্র বসবাসরত মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য মুসলিম জাতিসত্তা ব্যতিত সম্ভব নয়। চলমান,

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ০২

বিষয় :- আছাবিয়্যাত সম্পর্কে আলোচনা।

পাঠক, অনেক মুসলমান বিশেষ করে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর অধিকাংশ নেতা কর্মী মুসলিম জাতিসত্তা ও আছাবিয়্যাতকে এক ও অভিন্ন মনে করে যা সম্পূর্ণ ভূল। মুসলিম জাতিসত্তার ধারণা উম্মাহ কনসেপ্ট এর সহযোগী, পক্ষান্তরে উম্মাহ কনসেপ্ট এর সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আছাবিয়্যাত সাংঘর্ষিক ।

আছাবিয়্যাত শব্দটি হল ইবনে খালদুন এর একটি বিখ্যাত থিউরী যার ভিত্তিতে তিনি ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন। ইবনে খালদুন অধিকাংশ রাষ্ট্র সমূহের উত্থান পতনের পিছনে আছাবিয়্যাত এর ভূমিকা খোজে পেয়েছন । ইবনে খালদুন এর মতে আছাবিয়্যাত হল এমন একটি অনুভূতি যা কোন জনগোষ্ঠীকে আত্মরক্ষা সহ রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে। ইবনে খালদুন আছাবিয়্যাতকে ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি আছাবিয়্যাত এর আলোকে ল্যাটেনী সামাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য, পারসিক সাম্রাজ্য সহ আরো অনেক রাজবেশ্র ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

আছাবিয়্যাত হল গোত্র প্রীতি যার ইংরেজী হল Group Feeling, কোন গোত্রের জনগণ একই ব্যক্তির রক্তধারা হতে উৎসারিত। আছাবিয়্যাত সাধারণত একই রক্তধারা হতে উৎসারিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য। এটি কোন আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত নয় । গোত্র প্রীতি কখনো কখনো ভাল কাজ করে এবং কখনো কখনো খারাপ কাজ করে তবে অধিকাংশ সময় খারাপ কাজ করে থাকে।

রক্ত ধারার সাথে সম্পৃক্ত আছাবিয়্যাত এর সাথে বর্তমান যুগে ভাষা ও এলাকাভিত্তিক বিষয়াদি আছাবিয়্যাত এর সাথে যোগ হয়েছে। আছাবিয়্যাত এর প্রাচীন রূপ ও বর্তমান রূপ প্রায় এক ও অভিন্ন। গোত্র কেন্দ্রীক রাষ্ট্রের পাশাপাশি ভাষা ও এলাকা কেন্দ্রীক রাষ্ট্র গঠিত হয়। যেমন আরব জাতীয়তাবাদ , বাংগালী জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি। আছাবিয়্যাত কনসেপ্ট শক্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয়, আছাবিয়্যাত প্রতিষ্ঠার জন্য সব ধরনের অপরাধকে দায়মুক্তি দেয়া হয়। আছাবিয়্যাতের কারণে গণহত্যার ফলে অনেক জনগোষ্ঠী পৃথিবী

হতে হারিয়ে যায় ।

পক্ষান্তরে মুসলিম জাতিসত্তা হল ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে একটি অনুভূতি যা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এক পতাকাতলে সমবেত করে। মুসলিম জাতিসত্তা বা মুসলিম জাতীয়তাবাদের মধ্যে রক্তধারার কোন মূল্য নেই, এখানে ঈমান ও তাকওয়া হল মূল ভিত্তি। মুসলিম জাতিসত্তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল ইসলামের অনুসারীদের অস্তিত্ব রক্ষা করা এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল আল্লাহর আইন তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা।

আছাবিয়্যাতের ন্যায় মুসলিম জাতিসত্তা অপরাধের জন্য দায়মুক্তি দেয় না। আছাবিয়্যাত স্বৈরাচার তৈরি করে, কারণ এখানে আদর্শের কোন স্থান নেই। পক্ষান্তরে মুসলিম জাতিসত্তা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হবার কারণে জালিম তৈরির কোন সুযোগ নেই।

আছাবিয়্যাত মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করে, পক্ষান্তরে মুসলিম জাতিসত্তা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করে ।

আছাবিয়্যাত মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি, পক্ষান্তরে মুসলিম জাতিসত্তা মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক। মুসলিম জাতিসত্তার উৎস হল কুরআন ও সুন্নাহ । পক্ষান্তরে আছাবিয়্যাত অধিকাংশ সময় কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীতে অবস্থান নেয়। তারিখ ---৩০.০৬.২০২৫ ইং।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ০৩

বিষয় :-মুসলমানদের মধ্যে আছাবিয়্যাতের অনুপ্রবেশ ও এর কুফল।

পাঠক, আমি বিগত পর্বে আছাবিয়্যাত ও মুসলিম জাতিসত্তার স্বরূপ ও দুটির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পর্বে মুসলমানদের মধ্যে আছাবিয়্যাত এর অনুপ্রবেশ এবং এর কুফল সম্পর্কে আলোচনা করব। ওমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আছাবিয়্যাত আদর্শ হতে উদ্ভূত কোন ধারণা বা চেতনা নয় , বরং এটি হল একই রক্তধারা অথবা ভাষা অথবা এলাকার ধারণার সাথে সম্পৃক্ত হতে উৎসারিত একটি চেতনা। এই আছাবিয়্যাত মুসলমানদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং অস্তিত্ব বিনাশী । আমি কিভাবে আছাবিয়্যাত মুসলমানদের অস্তিত্ব বিনাশী , এই ব্যাপারে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করব ।

পাঠক, ১০৩০ সালে স্পেনে উমাইয়া খেলাফত এর পতনের পর সেখানের মূসলমানরা আছাবিয়্যাত এর খপ্পরে পড়ে। সেখানে মুদারী, হিমারী , বার্বার নামক আছাবিয়্যাত এর উত্থান ঘটে । ফলে স্পেন বহু ছোট ছোট রাজ্য এ বিভক্ত হয়ে যায় এবং আইবেরিয়ান পেনেনসুলায় ইসলামের সূর্য অস্তমিত হতে থাকে। অবশেষে সেখান থেকে মুসলমানরা উৎখাত হয় ।

আবার বর্তমান যুগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আরবদের মধ্যে আরব জাতীয়তাবাদের চেতনা জাহেলী যুগের আছাবিয়্যাত এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আরবরা উসমানীয় খিলাফতের বিরুদ্ধে আরব জাতীয়তাবাদের পতাকা তলে সমবেত হয়ে ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের সহযোগী হিসেবে যুদ্ধ করে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করে গোলামে পরিনত হয়। আজকের ফিলিস্তিনি মুসলমানদের দূর দশায় জন্য দায়ী হল আরব জাতীয়তাবাদ।

আবার সত্তর এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানে বাংগালী জাতীয়তাবাদের উত্থানের ফলে বাংগালী জাতীয়তাবাদীরা লক্ষ লক্ষ উর্দু ভাষী বিহারী মুসলমানদেরকে গণহত্যা চালায়। বাংগালী জাতীয়তাবাদ জাহেলী যুগের আছাবিয়াত এর
প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আছাবিয়্যাত একটি মুসলিম রিয়াসাতের জন্য মারাত্মক হুমকি। পাকিস্তানের বেলুচ , সিন্দী ইত্যাদি জাতীয়তাবাদ আছাবিয়্যাত এর সাথে সম্পৃক্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে আছাবিয়্যাত এর ক্ষুদ্র রূপ ও সমর্থন করে না। আছাবিয়্যাত এর ক্ষুদ্র রূপ হল আঞ্চলিক পর্যায়ে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব যা ইনসাফকে ভূ লুণ্ঠিত করে এবং ফিতনা ফাসাদের অন্যতম উৎস।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ০৪

বিষয় :-মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম জাতিসত্তার সুফল।

পাঠক, বিগত পর্বে আমি মুসলমানদের মধ্যে আছাবিয়্যাত এর অনুপ্রবেশ এবং এর কুফল সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পর্বে আমি মুসলিম জাতিসত্তা কিভাবে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে এই সম্পর্কে কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনা আলোচনা করব । ওমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ।

পাঠক, ১৪৯২ সালে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটলেও সেখানে কিছু সংখ্যক মুসলমানদের অস্তিত্ব ছিল। এই মজলুম মুসলিমগন তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ১৬১০ সালে মৌলভী আব্দুল্লাহ নামক উমাইয়া বংশীয় একজন বুজুর্গের নেতৃত্বে স্গ্রাম শুরু করে। যদিও এই স্গ্রাম ব্যার্থ হয়েছে, তবুও তা ছিল স্পেনে মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য শেষ লড়াই।

১৮৫৭ সালে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয়। এই স্কটময় মূহুর্তের ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বেংগল আসাম প্রদেশ গঠন মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তি মূল যার ফলে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন এবং এর ধারাবাহিকতায় ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম রাষ্ট্রের আবির্ভাব মুসলিম জাতিসত্তার অবদান। পাকিস্তানের পক্ষে ভারতীয় মুসলমানরা নিরুংকুশ সমর্থন দেয় , অথচ অনেক মুসলিম জানত যে, তাদের আবাসস্থল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আবার ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের অবসান হয় । ফলে সেখানে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে বসনিয়া নামক রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে।

এমনিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের অস্তিত্বের গ্যারান্টার হল মুসলিম জাতিসত্তা। এই মুসলিম জাতিসত্তার চেতনা মুসলমানদের এক পতাকাতলে সমবেত করে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের মধ্যে মুসলিম জাতিসত্তার চেতনা না থাকলে তারা অমুসলিমদের গোলামে পরিনত হতে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের মুসলমানরা শেখ আব্দুল্লাহ এর নেতৃত্বে মুসলিম জাতিসত্তা পরিত্যাগ করে ভারতে যোগ দিয়ে গোলামে পরিনত হয়, অপরদিকে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা মুসলিম জাতিসত্তাকে ধারন করে পাকিস্তানে যোগ দেয়ার ফলে গোলামী হতে মুক্তি পায় । কাজেই এক কথায় মুসলিম জাতিসত্তা হল আজাদীর কারণ এবং মুসলিম জাতিসত্তা পরিত্যাগ হল গোলামীর কারন।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ০৫
বিষয় :- খেলাফত ও উম্মাহ সম্পর্কে আলোচনা।
পাঠক, মুসলিম জাতিসত্তা ও ১৯০৫ সাল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল সম্পর্কে জানতে হলে উম্মাহ ও খেলাফত সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক এবং আমি এই পর্বে উম্মাহ ও খেলাফত সম্পর্কে আলোচনা করব। ওমা তাওফিকী ইল্লাহ বিল্লাহ।

যারা ইসলামে বিশ্বাসী তারা সবাই উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত। উত্তর কোরিয়ার কোন শহরে যদি একশত মুসলিম বসবাস করে তারা উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত। খিলাফত হল উম্মাহর একটি রাজনৈতিক কাঠামো যার মাধ্যমে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা হয় । উম্মাহর কিছু সদস্য খেলাফতের জুরিসডিকশনের আওতায় থাকে না, কারণ তারা অমুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা। কাজেই খেলাফত ও উম্মাহ কনসেপ্ট এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। উম্মাহর বৃহত্তর অস্তিত্বের জন্য খেলাফত আবশ্যক। কারণ উম্মাহর কোন সদস্য সমস্যায় নিপতিত হলে দারুল খিলাফতের উপর কর্তব্য হল উম্মাহর বিপদগ্রস্ত ও মজলুম সদস্য অথবা জনগোষ্ঠীর সহায়তায় হস্ত প্রসারিত করা । উম্মাহর এই বিপদ গ্রস্ত সদস্য খিলাফত রাষ্ট্রের অধীনে হোক অথবা না হোক, উম্মাহর সদস্য অথবা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা খিলাফত রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য।

পাঠক, খিলাফত আমলে এই ব্যাপারে দারুল খিলাফাহ কিভাবে এই মহান দায়িত্ব পালন করছেন এর কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করব যাতে খিলাফতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন।

উমাইয়া খিলাফত আমলে সিন্ধুর রাজা দাহির তহুরা নামক এক মুসলিম মহিলার শ্লীলতাহানি করলে ঐ মহিলা উমাইয়া খেলাফত এর পূর্বাঞ্চলীয় ভাইসয়র হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ এর নিকট পত্র পাঠান। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে হাজ্জাজ ইবনে ইউনূস রাজা দাহিরকে শায়েস্তা করার জন্য মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করে দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধুকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসেন ।আব্বাসী খিলাফত আমলে ক্রুসেডাররা যখন সিরিয়ার উপকুল অন্তবর্তী মুসলিম এলাকা দখল করে সেখানে তান্ডব চালায় এবং মুসলিম এলাকায় আগ্রাসন চালায় , তখন আব্বাসী খলিফা সেলজুক সুলতানদের এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য পত্র দিলে সেলজুক বাহিনী ক্রসেডারদের পরাস্ত করলে ক্রসেডারদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

অনুরূপভাবে, দারুল খিলাফাহ উম্মাহর বিপদের সময় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, এমন বহু উদাহরণ রয়েছে। উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের প্রতি দারুল খিলাফার দায়িত্ব রয়েছে যা খলিফাগন তাদের নিজেদের সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করেছেন। কাজেই উম্মাহর অবশ্য কর্তব্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। দারুল খিলাফা ব্যতিত উম্মাহর সদস্যরা অরক্ষিত।আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় খিলাফত বিপদের সম্মুখীন হলে উম্মাহর ভারতীয় সদস্যরা দারুল খিলাফাকে রক্ষার জন্য স্গ্রাম শুরু করে যা খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত। কাজেই উম্মাহ ও খিলাফত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ০৬

বিষয় :- খেলাফত , উম্মাহ ও মুসলিম জাতিসত্তার সম্পর্ক।
পাঠক, আমি ইতিপূর্বে খেলাফত ও উম্মাহর সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই পর্বে আমি খেলাফত , উম্মাহ ও মুসলিম জাতিসত্তার সম্পর্কে আলোচনা করব। কারণ বাংলাদেশের অনেকে ইসলামপন্থীগন এই তিনটির সম্পর্ক নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে এবং উম্মাহ ও খেলাফত কনসেপ্ট এর সাথে মুসলিম জাতিসত্তাকে সাংঘর্ষিক মনে করেন।

মুসলিম জাতিসত্তার সাথে খেলাফত ও উম্মাহ কনসেপ্ট এর কোন বিরোধ নেই। কারণ মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তি আছাবিয়্যাত নয় , এর ভিত্তি হল তাওহীদ তথা ঈমান।

মুসলিম জাতিসত্তার প্রতিটি সদস্য উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত। এরা দারুল খিলাফার ভৌগলিক জুরিসডিকশনের মধ্যে নেই । মুসলিম জাতিসত্তার সদস্যরা দারুল খিলাফার অধীনে না থেকেও দারুল খিলাফার প্রতি অনুগত এবং দারুল খিলাফাকে তাদের অভিভাবক মনে করে।

পাঠক, ১৯০৫ সালে ঢাকাকে কেন্দ্র করে মুসলিম জাতিসত্তার উত্থান ঘটে এবং এর প্রভাব কিছুদিনের মধ্যেই সারা ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এই ভারতীয় মুসলমানরা দারুল খিলাফার অধীনে ছিল না।

দারুল খিলাফতের অধীনে নয় এমন পরাধীন এলাকা সমূহ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুসলিম জাতিসত্তার পতাকাতলে সমবেত হয় । মুসলিম জাতিসত্তা আর গোত্র প্রীতি এক নয়, মুসলিম জাতিসত্তা হল উম্মাহর মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন অংশের মুসলমানদের অস্তিত্বের গ্যারান্টার, পক্ষান্তরে আছাবিয়্যাত হল উম্মাহর ঐক্য বিনষ্ট কারী ভাষা ভিত্তিক বা গোত্র ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, উদাহরণ স্বরূপ আরব জাতীয়তাবাদ, বাংগালী জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি। উম্মাহর কোন অংশ যখন অমুসলিম শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে চেতনা ধারণ করে তা হল মুসলিম জাতিসত্তা। মুসলিম জাতিসত্তার প্রতিটি সদস্য উম্মাহর সদস্য। উম্মাহর পাশাপাশি তাদের অস্তিত্বের জন্য মুসলিম জাতিসত্তার চেতনা ধারণ করে।

পাঠক, আপনি যদি বিচ্ছিন্ন মুসলিম ভূখন্ডের মুসলমানদের অস্তিত্বের গ্যারান্টার মুসলিম জাতিসত্তাকে উম্মাহর কনসেপ্ট এর সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেন তাহলে আপনি সাওয়াবের নিয়তে ঈমানের সাথে নিজের পেটে নিজে ছুরি চালাচ্ছেন ।
এদেশের ইসলাম পন্থীরা মুসলিম জাতিসত্তাকে যদি উম্মাহর কনসেপ্ট এর পাশাপাশি ধারণ না করে তাহলে তাদের অস্তিত্ব সব সময় স্কটে থাকবে।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ০৭
বিষয় :- সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও মুসলিম জাতিসত্তা।

পাঠক, এই পর্বে আমি সভ্যতার দ্বন্দ্ব এবং মুসলিম জাতিসত্তা সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠক, সভ্যতার দ্বন্দ্বের দৃষ্টিকোন থেকে যদি দেখেন বৌদ্ধ ধর্ম কেন্দ্রীক বৌদ্ধ সভ্যতার দেশ হল বার্মা, ইসলামী সভ্যতা কেন্দ্রিক দেশ হল বাংলাদেশ এবং পৌত্তলিক প্রাধান্য সভ্যতার দেশ হল ভারত। বলতে গেলে বা্লাদেশ হল দুইটি অমুসলিম সভ্যতার মধ্যে ইসলামী সভ্যতার ধারক একটি দেশ। বাংলাদেশ হল সভ্যতার দ্বন্দ্বের এক অনিবার্য পরিণতি। কারণ আমার জানামতে পৃথিবীতে দুটি সভ্যতার মধ্যে তৃতীয় একটি সভ্যতার অস্তিত্ব নেই।
এই সভ্যতার দ্বন্দ্বের মূল ভিত্তি হল ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশের মাধ্যমে। কাজেই আপনি ১৯০৫ সালকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

মুসলিম জাতিসত্তার সাথে পার্থিব ও পরকালীন বিষয়াদি জড়িত। মুসলিম জাতিসত্তা ইসলামী সভ্যতার সাথে সম্পৃক্ত ।

রাষ্ট্র গঠনের সাথে জাতি সত্তার সম্পর্ক খুবই গভীর। আবার জাতিসত্তা একটি সভ্যতাকে রক্ষা করে। জাতি সত্তা না থাকলে সভ্যতা বিলুপ্তি ঘটে।

পাঠক, আপনি আজকের আরবদের গোলামীর ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করেন, তাহলে দেখবেন যে তারা ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে ডাচদের দ্বারা আগ্রাসনের শিকার হতে যাচ্ছিল, এমন সময় আরব নেতারা উম্মাহর ভিত্তিতে উসমানীয় সুলতান সেলিমকে তাদেরকে উদ্ধার করার করার জন্য আহ্বান করেন। উসমানীয় সুলতান তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদেরকে খ্রীষ্টানদের কবল থেকে উদ্ধার করে।

আবার আরবরা উম্মাহর কনসেপ্টকে বিসর্জন দিয়ে যখন আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে খ্রীষ্টানদের সহায়তায় উসমানীয় খিলাফতকে পরাজিত করে একাধিক আরব রাষ্ট্র গঠন করে ইহুদি খ্রিস্টানদের গোলামে পরিনত হয়। এমনিভাবে যদি উম্মাহ অথবা মুসলিম জাতিসত্তাকে বাদ দিয়ে ভাষা ভিত্তিক, গোত্র ভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হলে মুসলমানদের জন্য গোলামী অনিবার্য।

কাজেই সভ্যতার দ্বন্দ্বে বিজয়ী মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে যদি বাংলাদেশ মুসলিম জাতিসত্তা পরিত্যাগ করে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পতাকা ধারন করে তাহলে এদেশের অস্তিত্ব হারাবে । তারিখ.

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ০৮
বিষয় :- রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল হিসেবে আছাবিয়্যাত, ইসলামী সভ্যতা ও মুসলিম জাতিসত্তা।

পাঠক, আমি ইতিপূর্বে আছাবিয়্যাত সম্পর্কে আলোচনা করেছি যে , আছাবিয়্যাত হল একই রক্তধারা হতে উৎসারিত এমন একটি চেতনা যার ফলে নিজেদের আত্মরক্ষা সহ রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে থাকে। এটি হল আছাবিয়্যাত এর প্রাচীন রূপ । এই আছাবিয়্যাত এর ভিত্তিতে মানব ইতিহাসের অধিকাংশ রাজ্য গঠিত হয়েছে।

এই রক্তধারার সাথে বর্তমান যুগে ভাষা ও কোন কোন ক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত যুক্ত হয়েছে । অথাৎ বর্তমান যুগে ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হয়ে থাকে। আবার কদাচিৎ ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে কোন কোন রাষ্ট্র গঠিত হয়। আবার এসব রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাচীন আছাবিয়্যাত লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকায় প্রাচীন আছাবিয়্যাত এর প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। সেখানে এখনো জাতিগত দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ লোক মারা যায়।

মানব সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, আছাবিয়্যাত হল রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদান। আপনি এক কথায় বর্তমান কালে জাতীয়তাবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারেন। আগে রাষ্ট্র গঠনের জন্য যে আছাবিয়্যাত ছিল, সেটি ছিল ব্যাক্তি কেন্দ্রীক বা পরিবার কেন্দ্রিক। বর্তমানে রাজতান্ত্রিক দেশে এই পরিবার কেন্দ্রিক আছাবিয়্যাত দেখতে পাবেন, যেমন সৌদি আরবে আলে সৌদ আছাবিয়্যাত হল সৌদি আরব গঠনের মূল উপাদান।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যতটুকু জানা যায়, মদীনা নামক রাষ্ট্রটি প্রথম রাষ্ট্র যা আছাবিয়্যাত এর ভিত্তিতে হয় নি । মদীনা রাষ্ট্রের লিগ্যাসি বহন কারী খিলাফত রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল ইসলাম। কারণ ইসলাম জাহেলী যুগের আছাবিয়্যাতকে সমর্থন করে না। ইসলাম রক্তধারা, ভাষা ও এলাকাভিত্তিক আছাবিয়্যাতকে সমর্থন করে না।

ইসলাম আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্রকে উৎসাহিত করে। মুসলিম জাতিসত্তা যেহেতু ইসলাম হতে উদ্ভুত একটি আদর্শিক চেতনা, তাই মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে কোন রাষ্ট্র গঠিত হলে ঐ রাষ্ট্রকে আছাবিয়্যাত রাষ্ট্র বলার কোন সুযোগ নেই। তবে আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র যদি আছাবিয়্যাত এর কারনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে তা গোলামীর দিকে ধাবিত হয়।

আবার ইসলামী সভ্যতার ধারক বাহকগন যদি নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাষ্ট্র গঠনের দিকে অগ্রসর হয় , তাহলে তা শরীয়ত সম্মত। যেমন বসনিয়া , তুর্কি সাইপ্রাস।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ০৯

বিষয় :- সভ্যতা সম্পর্কিত আলোচনা।

ইবনে খালদুন সভ্যতাকে বেদুইনী সভ্যতা ও নগর সভ্যতা এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। বেদুইনী সভ্যতা বা নগর সভ্যতা উভয় সভ্যতায় আছাবিয়াতের প্রভাব বিদ্যমান। বেদুইনী সভ্যতায় এক গোত্র অপর গোত্রের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য গোত্র পতির নেতৃত্বে এক পতাকা তলে সমবেত হয় ।

পাঠক, আপনি আফ্রিকার হাবশী, জানজী ও বার্বার জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বেদুইন গোত্রের মধ্যে এই গোত্রপ্রীতির প্রভাব এখনো লক্ষ্য করবেন।

এবার আসা যাক, নগর সভ্যতার মধ্যে গোত্রপ্রীতির প্রভাব। নগর সভ্যতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। নগর রাষ্ট্র, সাম্রাজ্য। উভয়ের মধ্যে গোত্র প্রীতি বিদ্যমান ছিল। প্রাচীনকালে এই গোত্র প্রীতি ছিল ব্যাক্তি ও পরিবার কেন্দ্রিক। বর্তমানে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এই ব্যাক্তি ও পরিবার কেন্দ্রিক গোত্র প্রীতি দেখা যায়।

বর্তমান হ্যান্টি্টন সভ্যতার দ্বন্দ্ব নামক একটি নতুন ধারনা প্রদান করেছেন। তিনি সভ্যতার দ্বন্দ্ব বলতে মূলত ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও স্ঘাতকে বুঝিয়েছেন। তবে এই সভ্যতার দ্বন্দ্ব মধ্যযুগেও ছিল, উদাহরণ স্বরূপ ক্রুসেড যুদ্ধ যা মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে কয়েক শতাব্দী যাবৎ অব্যাহত ছিল। ১০৯৯ সালে ক্রুসেডারদের যে ঐক্য সেটা ছিল ধর্ম কেন্দ্রীক। আবার প্রতিরোধ ছিল ধর্ম কেন্দ্রীক । অর্থাৎ বৃহৎ দুই সভ্যতা অর্থাৎ খ্রিস্টান ও ইসলামী সভ্যতার দ্বন্দ্ব।

আধুনিক যুগে ভারত ও পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠন সভ্যতার দ্বন্দ্বের একটি উদাহরণ। এই পাকিস্তানের ভিত্তি মূল ছিল ১৯০৫ যার সূত্র ধরে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান গঠিত হয়। এবং পাকিস্তানের সূত্রে বর্তমান বাংলাদেশ। তাই ১৯০৫ হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল।
চলমান, তারিখ ----০৭.০৭.২০২৫ ইং

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১০

বিষয় :- আছাবিয়্যাত ও সভ্যতা সম্পর্কিত আলোচনা।

পাঠক, আমি ইতিপূর্বে আছাবিয়্যাত এর প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি । আছাবিয়্যাত ও সভ্যতার এর মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে আছাবিয়াত অপরিহার্য উপাদান, পক্ষান্তরে সভ্যতা রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে অনেক সময় অপরিহার্য উপাদান নয় । একটি আদর্শিক রাষ্ট্র কখনো আছাবিয়্যাত এর ধারক বাহক হতে পারে না ।

একই সভ্যতার অধীনে আছাবিয়্যাত এর ভিত্তিতে একাধিক রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং এই রাষ্ট্রগুলোর গঠনের মুলে ধর্ম বা কোন আদর্শ থাকে। একই সভ্যতার অধীনে ধর্ম এক হলে ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য ভিন্ন আছাবিয়্যাত গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপ মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশ গুলো মুসলিম সভ্যতার অংশ হলে ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে তাদের মূল উপাদান ধর্ম নয় বরং স্থানীয় শাসকগোষ্ঠী বা অন্যবিধ গোত্র প্রীতি হল তাদের মূল উপাদান।

ইউরোপের দেশগুলো খ্রীষ্টান অধ্যুষিত হলেও ধর্মের শাখাগুলো যেমন অর্থোডক্স, ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টেটান প্রাথমিক ভাবে রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান। রাশিয়া অর্থোডক্স খ্রিস্টান, তাই রাশিয়ার মূল উপাদান হল অর্থোডক্স খ্রিস্টান ও রুশ ভাষা। ইউরোপীয় দেশগুলো বহু দিন ধর্মীয় শাখাগত আছাবিয়াতে বিশ্বাসী ছিল। আবার ইউরোপের কিছু দেশ আছাবিয়্যাত এর ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে, যেমন সার্বিয়া।

পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো বৌদ্ধ সভ্যতার অনুসারি হলেও ভাষা এবং পরিবারকেন্দ্রিক আছাবিয়্যাত বৌদ্ধ সভ্যতার অনুসারীদের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভক্ত করেছে । বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল ১৯০৫ যা সভ্যতার দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত। এদেশের মুল ভিত্তি আছাবিয়্যাত নয় , মূল ভিত্তি হল সভ্যতার দ্বন্দ্ব যার সূত্রপাত ১৯০৫ সালে শুরু হয়। আদর্শিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে কুরআন ও সুন্নাহর আইন তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১১

বিষয় :- লিগ্যাসি সম্পর্কে আলোচনা।

পাঠক, লিগ্যাসি হল এমন একটি চেতনা বা আদর্শ যা পূর্ববর্তী হতে পরবর্তীদের নিকট বাহিত হয়। অথাৎ পরবর্তী প্রজন্ম যখন পূর্ববর্তীদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে তখন বলা হয় যে , এই জনগোষ্ঠী অমুক লিগ্যাসি বহন করে।এই লিগ্যাসি সব ধরনের রাষ্ট্র বহন করে। অথাৎ আছাবিয়্যাত বা আদর্শিক উভয় ধরনের রাষ্ট্র লিগ্যাসি বহন করে। এই লিগ্যাসি দুই প্রকার, একটি হল আছাবিয়্যাত ও ভূখণ্ডগত লিগ্যাসি , অপরটি হল আদর্শিক লিগ্যাসি ।

লিগ্যাসি শব্দটি ইদানিং কোন রাষ্ট্র বা আদর্শের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই লিগ্যাসি সময়ের বন্ধনে আবদ্ধ নয় । অনেক সময় একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরেও একটি লিগ্যাসির মাধ্যমে সভ্যতার পরিচয় বহন করা হয় । উদাহরণ স্বরূপ, ১৪৯২ সালে স্পেনে মুসলিম শাসনের পতনের আরো অনেক বছর পর ১৬১০ সালে উমাইয়া ব্েশর মৌলভী আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার নেতৃত্বে স্পেন মুসলিম সভ্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানরা স্গ্রাম শুরু করে। এই ক্ষেত্রে মৌলভী আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়া স্পেনের উমাইয়া খিলাফতের লিগ্যাসি বহন করতেন ।

কাজেই রাষ্ট্র গঠন বা রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টার সাথে লিগ্যাসি ওৎপোতভাবে জড়িত। আবার আনাতুলিয়াতে সেলজুক শাসনের পতনের পর সেখানে তুর্কিদের বিভিন্ন গোত্র রিয়াসাত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল , তারা সবাই তুর্কি ও সেলজুক লিগ্যাসি বহন করত । কারণ আনাতুলিয়াকে সেলজুক তুর্কিরা ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসে , অবশ্য এই সব তুর্কিরা ইসলামী সভ্যতাকে ধারন করত । তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সভ্যতা টিকিয়ে রাখা। পক্ষান্তরে আরব জাতীয়তাবাদ ছিল ইসলামী সভ্যতা বরবাদ করার আন্দোলন। আনাতুলিয়্যার তুর্কিরা আদর্শিক ইসলামের আদর্শিক লিগ্যাসি বহন করত ।

পাঠক, মুসলমানদের মধ্যে ভাষাগত জাতীয়তাবাদ সব সময় পতন ডেকে আনে এবং মুসলমানদের হাতে মুসলমানদের রক্ত ঝড়ায় । উসমানী খিলাফত পতনের পিছনে ভাষা ভিত্তিক জাহেলী যুগের আরব জাতীয়তাবাদ দায়ী। ইতিহাস পাঠ করলে আপনি তা দেখতে পাবেন এর প্রমাণ পাবেন। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ কত ভয়াবহ তা কল্পনার ও বাহিরে। উদাহরণ স্বরূপ এদেশে বা্লা ভাষাগত আছাবিয়্যাত এর কারণে লক্ষ লক্ষ নিরীহ উর্দূভাষী মুসলমানদেরকে গণহত্যা চালানো হয়।
মুসলমানদের মধ্যে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ইসলামী সভ্যতার লিগ্যাসি বহন করে না, বরং তারা ইসলামের শত্রুদের হয়ে কাজ করে । অপরদিকে মুসলিম জাতিসত্তা ইসলামী লিগ্যাসি বহন করে।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১২
বিষয় :- খন্ডিত লিগ্যাসি সম্পর্কে আলোচনা।

পাঠক, আমি বিগত পর্বে লিগ্যাসি সম্পর্কে আলোচনা করেছি।এখন খন্ডিত লিগ্যাসি সম্পর্কে আলোচনা করব।

অনেক সময় অনেক রাষ্ট্র শক্তির পতনের পর ঐ পতিত রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়, তখন বলা হয় যে, এই নব্য রাষ্ট্রটি পুরাতন রাষ্ট্রের লিগ্যাসি বহন করে। আবার এই লিগ্যাসি অনেক সময় সময়ের ব্যবধানে উজ্জীবিত হয়ে থাকে।উদাহরণ স্বরূপ, ১২৫৮ সালে বাগদাদের আব্বাসী খিলাফতের পতনের কিছু দিন পর কায়রোর আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হলে কায়রোর আব্বাসী খিলাফত বাগদাদের আব্বাসী খিলাফতের লিগ্যাসি বহন করত।

আবার কোন রাজশক্তি বিভক্ত হবার পর বিভক্ত রাজশক্তি তাদের সাধারণ লিগ্যাসি বহন করে। উদাহরণ স্বরূপ সেলজুক সালতানাত যখন নিশাপুরের সেলজুক ও রোম সেলজুক দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন উভয় রাজশক্তি তাদের সাধারণ লিগ্যাসি সেলজুক বহন করত।অনুরূপভাবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাশিয়া সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের লিগ্যাসি বহন করে। এই লিগ্যাসি হল ভূখণ্ডগত লিগ্যাসি। আবার বর্তমান রাশিয়া অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের লিগ্যাসি বহন করে।

আবার বর্তমান তুরস্ক উসমানীয় সালতানাতের খন্ডিত লিগ্যাসি বহন , ইরান সাভাফী সাম্রাজ্যের খন্ডিত লিগ্যাসি বহন করে। পাকিস্তান মোগল সাম্রাজ্যের খন্ডিত লিগ্যাসি বহন করে।

লিগ্যাসি সময়ের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় , কখনো কখনো কোন লিগ্যাসি সময়ের ব্যবধানে উজ্জীবিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ বে্গল সালতানাতের খন্ডিত লিগ্যাসি বহন করে। আবার নিকট অতীতের লিগ্যাসিকে দূরবর্তী সময়ের লিগ্যাসির সাথে সমন্বয় করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বা্লাদেশের নিকট অতীতের লিগ্যাসি হল ১৯০৫ সালের বৃগ ভ্গ এবং দূরবর্তী সময়ের লিগ্যাসি হল বে্গল সালতানাত।

এমনিভাবে পৃথিবীতে বিভিন্ন রাজশক্তি ও রাষ্ট্র কোন না কোন লিগ্যাসী বহন করে । কখনো কখনো লিগ্যাসি ব্যতিত রাষ্ট্র গঠিত হয়, কিন্তু সেই রাষ্ট্র পরিচয় স্কটে ভোগে এবং অচিরেই তা অন্য রাষ্ট্রে বিলীন হয় অথবা বিলীন হবার উপক্রম হয়। উদাহরণ স্বরূপ কমিউনিস্ট শাসনামলের পূর্ব জার্মানি। আওয়ামী আমলে বাংলাদেশ ভারতে বিলীন হবার উপক্রম হয়, কারণ আওয়ামী লীগ কোন লিগ্যাসি বহন করে না, আর ভাষা ভিত্তিক যে লিগ্যাসির কথা বলে তা কোন লিগ্যাসি নয় , কারণ ভাষা কখনো স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন ও অস্তিত্বের জন্য লিগ্যাসির ভিত্তি হতে পারে না।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১৩

বিষয়:- লিগ্যাসির আবশ্যিকতা।

পাঠক, কোন রাষ্ট্র আছাবিয়্যাত এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক অথবা আদর্শিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক তা কোন না কোন লিগ্যাসি বহন করে। কোন রাষ্ট্র যদি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয় এবং তা কোন লিগ্যাসি বহন না করে তাহলে সেই রাষ্ট্র যত শক্তিশালী হোক না কেন , অচিরেই এসব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ চে্গিশ খার নেতৃত্বে মো্গল সাম্রাজ্যের উত্থান লিগ্যাসি বহন না করায় কিছুদিনের মধ্যেই পতন ঘটে।

একটি রাষ্ট্র বেশ কয়েক ধরনের লিগ্যাসি বহন করে। প্রথমত - পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র আছাবিয়্যাত ভিত্তিক লিগ্যাসি বহন করে। খুব অল্প স্খ্যক রাষ্ট্র আদর্শিক লিগ্যাসি বহন করে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বসনিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে ইসলামের আদর্শিক লিগ্যাসি বহন করে। যদিও এসব রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে শরীয়া অনুসরণ করে না।

পাঠক, কোন রাষ্ট্র আছাবিয়্যাত ভিত্তিতে গঠিত হোক অথবা আদর্শিক ভিত্তিতে গঠিত হোক, আত্মরক্ষা সহ রাষ্ট্রীয় ভিত্তির মজবুতীর জন্য লিগ্যাসি আবশ্যক।

উদাহরণ স্বরূপ, হযরত ওমরের আমলে উত্তর আফ্রিকা ইসলামের পতাকাতলে আসে এবং একই সময় পারস্য সাম্রাজ্য ইসলামের পতাকাতলে আসে। ইসলামের পতাকাতলে আসার পর পারস্য সাম্রাজ্যের লিগ্যাসি বহনকারী কোন জনগোষ্ঠী না থাকায় পরবর্তীতে মুসলমানদের কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি।

অপরদিকে আফ্রিকার জিনতা ও কুতামা জনগোষ্ঠী বারবার লিগ্যাসি বহন করার কারণে মুসা বিন নুসাইর শাসনামল পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই বারবার জনগোষ্ঠী জাহেলী যুগের আছাবিয়্যাত ধারণ করত। মুসা বিন নুসাইর এর দাওয়াতের বদৌলতে হাজার হাজার বার্বার ইসলাম গ্রহণ করার ফলে তারা খিলাফত ভিত্তিক আদর্শিক রাষ্ট্রের সহযোগী হয়ে উঠে। স্পেন বিজয়ী তারিক বিন জিয়াদ এই বারবার জনগোষ্ঠীর ছিল।

আবার ভূল লিগ্যাসি বহন করলে গোলামে রূপান্তরিত হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ আরব জাতীয়তাবাদীরা ইসলামী লিগ্যাসি পরিত্যাগ করে ভূল লিগ্যাসি বহন করার কারণে তারা গোলামে পরিনত হয়েছে। বস্তুত ইসলাম আগমনের পূর্বে মুদারী আরবরা কোন রাজনৈতিক লিগ্যাসি বহন করত না, হিমারি আরবরা কিছু

লিগ্যাসি বহন করলেও এই লিগ্যাসি নি্শেষের পথে ছিল। আর আরবদের যে রাজনৈতিক লিগ্যাসি তা হল, ইয়েমেনের কয়েক জন তুব্বা বাদশাহ ব্যতিত সবটুকুই জাহেলী যুগের আছাবিয়্যাত ভিত্তিক লিগ্যাসি যার মধ্যে কুফরীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আরবরা জাহেলী যুগের কুফরী মিশ্রিত ঠুনকো লিগ্যাসি গ্রহণ করার জন্য অমুসলিমদের গোলামে পরিনত হয়েছে।

যে কোন রাষ্ট্রের পরিচয়ের জন্য লিগ্যাসি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ তুরস্কের নাম নিলে উসমানীয় সালতানাতের কথা এসে যায়, আবার ইরানের নাম নিলে সাফাভী সাম্রাজ্যের কথা এসে যায়। লিগ্যাসি নিজেদের লোকদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে, চাই তা আছাবিয়্যাত ভিত্তিক লিগ্যাসি হোক অথবা আদর্শিক ভিত্তিক লিগ্যাসি হোক। তাই বাংলাদেশকে অবশ্যই লিগ্যাসি বহন করতে হবে, সেই লিগ্যাসি হল বে্গল মুসলিম সালতানাত এবং ১৯০৫ সালের মুসলিম স্খ্যা গরিষ্ঠ বে্গল আসাম প্রদেশ ।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১৪

বিষয়:- বাংলাদেশে ভাষা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত ও আদর্শিক লিগ্যাসির দ্বন্দ্ব।

পাঠক, আমি বিগত পর্বে লিগ্যাসি সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং বাংলাদেশ কোন লিগ্যাসি বহন করে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। বাংলাদেশে মূলত ভাষা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত ও আদর্শিক লিগ্যাসির দ্বন্দ্ব চলমান। যারা মনে করে যে, ভাষার ভিত্তিতে এদেশের জন্ম তারা কোন লিগ্যাসি ধারন করে না।
কারণ ভাষার ভিত্তিতে এই ভূখণ্ডে কখনো কোন রাজ্য ছিল না অথবা রাজ্য গঠনের উদ্যোগ ও নেয়া হয় নি।

এই ভূখণ্ডে আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন হয়েছে অথবা করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য যারা মনে করে যে, দেশটির উপাদান হল ভাষা তারা কখনো ১৯৫২ সালের আগের ইতিহাস বলবে না, ১৯৫২ সালের পূর্বে এদেশের মুসলমানদের অবস্থা কত করুন ছিল তারা ভূলেও উচ্চারন করবে না।আবার এদেশের অখন্ড ভারতের সমর্থক কিছু মৌলভী ১৯১৯ সালের পূর্বের ইতিহাস মুখে নেয় না। এই দুই শ্রেণীর লোকজন ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে লিপ্ত। প্রথম দল অপেক্ষা দ্বিতীয় দল এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য অধিকতর ক্ষতিকর ।

এদিকে আরেক গন্ড মূর্খ জাহেলে মুরাক্কাবের দল ১৯৭১ সালের সালের পূর্বের ইতিহাস উচ্চারন করে না। আবার ইসলাম পন্থীদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা এই ইতিহাস সম্পর্কে জাহেল । এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দেশপ্রেম থাকলে ও যোগ্য রাহবারের অভাবে পথহারা। এই দুই শ্রেণী তাদের পূর্ব পুরুষদের অস্তিত্বের স্গ্রামের ইতিহাস জানে না। ভূল নেতৃত্ব এদেরকে বিভ্রান্ত করতেছে। এই শ্রেণীর উচিত ভূল নেতৃত্ব পরিহার করে মুসলিম জাতিসত্তার পতাকার নীচে সমবেত হওয়া।

বস্তুত ভাষা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত এর কোন লিগ্যাসি অথবা আদর্শ নেই। এদের মূল উদ্দেশ্য হল ক্ষমতায় এসে লুটপাট করা এবং লুটপাটের জন্য প্রয়োজনে দেশকে অমুসলিমদের নিকট বন্ধক রাখবে। বিগত দিনের ইতিহাস আমাদেরকে তাই বলে।

পাঠক, এদেশে এখন রাজনৈতিক ময়দানে ভাষা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত ধারী ও ইসলামী আদর্শের লিগ্যাসি বহন কারীদের দ্বন্দ্ব চলমান। তবে এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য মুসলিম ও ইসলামী লিগ্যাসির বিজয় আবশ্যক। ইসলামী লিগ্যাসির বিজয়ের অন্যতম সোপান হল ১৯০৫ সালকে এদেশের ভিত্তি মূল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা ।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১৫
বিষয়:- আদর্শগত লিগ্যাসি ও ভূখণ্ডগত লিগ্যাসি।

পাঠক, একটি রাষ্ট্র আছাবিয়াত এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে দুই ধরনের লিগ্যাসি বহন করে, আদর্শগত লিগ্যাসি এবং ভূখণ্ডগত লিগ্যাসি। উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়া অর্থোডক্স আদর্শের লিগ্যাসি বহন করে, আবার ভূখণ্ডগতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের লিগ্যাসি বহন করে।
মুসলমানদের মধ্যে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ইসলামী সভ্যতার লিগ্যাসি বহন করে না, বরং তারা ইসলামের শত্রুদের হয়ে কাজ করে । অপরদিকে মুসলিম জাতিসত্তা ইসলামী লিগ্যাসি বহন করে ।

অনেক সময় অনেক রাষ্ট্র শক্তির পতনের পর ঐ পতীত রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়, তখন বলা হয় যে, এই নব্য রাষ্ট্রটি পুরাতন রাষ্ট্রের লিগ্যাসি বহন করে।বাংলাদেশ ভূখণ্ডগতভাবে সাবেক পাকিস্তানের পূর্বাংশ পূর্ব পাকিস্তানের লিগ্যাসি বহন করে যা স্ বিধান কর্তৃক স্বীকৃত । আদর্শিক ভাবে কোন লিগ্যাসি বহন করে, তা স্পষ্ট নয়।

১৯৭২ সালের স ংবিধানে ইসলামকে অবজ্ঞা করা হয় এবং ভাষাকে প্রাধান্য দেয়া হয় যা ইসলামী সভ্যতা ও মুসলমানদের অস্তিত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। পরবর্তীতে তা স্ শোধন করে ইসলামী আদর্শ সন্নেবেশিত করা হয়।যেহেতু স ংবিধানে ইসলামী সভ্যতাকে লিগ্যাসি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তাহলে এদেশের মূল ভিত্তি হল মুসলিম জাতিসত্তা।

এখন আসা যাক, এই ভূ খন্ডে মুসলিম জাতি সত্তার সূত্রপাত কখন। ১২০৪ সালে এই ভূখণ্ডে ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হয়, অতঃপর বেংগল মুসলিম সালতানাত, অতঃপর দীর্ঘ উপনিবেশ শাসনের শেষ দিকে পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানদেরকে হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচার হতে রক্ষার জন্য মুসলিম জাতিসত্তার উত্থান হয় ।

১৯০৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহ এর নেতৃত্বে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে মুসলিম স্খ্যা গরিষ্ট বেংগল আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। এটি হল এদেশের মূল ভিত্তি। এই এই মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ বাংলা ভাষার ভিত্তিতে করা হয় নি, এটি ছিল মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে। কারণ এই প্রদেশের মহানায়ক নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন একজন উর্দু ভাষী মুসলিম।

কাজেই এই বাংলাদেশে ভাষার ভিত্তিতে জাতিসত্তা সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতি বিরোধী ও আত্মঘাতী। কাজেই এদেশের অস্তিত্বের স্বার্থেই ১৯০৫ সালের লিগ্যাসি বহন করতে হবে।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১৬

বিষয়:- বাংলাদেশের আদর্শিক লিগ্যাসি কি ?

পাঠক, বাংলাদেশের আদর্শিক লিগ্যাসি কি? এই বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে আদর্শিক লিগ্যাসি সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

পৃথিবীর রাষ্ট্র সমূহের ইতিহাস পাঠ করলে আপনি দেখতে পাবেন অনেক রাষ্ট্র আদর্শিক লিগ্যাসি বহন করে। উদাহরণ স্বরূপ যুক্ত রাজ্য --প্রোটেষ্টান ধর্মীয় লিগ্যাসি বহন করে। রাশিয়া --অর্থোডক্স ধর্মীয় লিগ্যাসি বহন করে, ভ্যাটিকান-- ক্যাথলিক ধর্মীয় আদর্শিক লিগ্যাসি বহন করে। ইরান ---শিয়া আদর্শিক লিগ্যাসি বহন করে।

এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কোন আদর্শিক লিগ্যাসি বহন করে। ভাষা ও রক্তধারা হতে উৎসারিত আছাবিয়্যাত কখনো আদর্শিক লিগ্যাসি নয় । ভাষা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত ও রক্ত ধারা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত এর মধ্যে পার্থক্য হল ভাষা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত বাহির থেকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত, পক্ষান্তরে রক্তধারা ভিত্তিক আছাবিয়্যাত ভিতর হতে উজ্জীবিত হয়ে থাকে। যদিও উভয় প্রকার আছাবিয়্যাত ইসলামে কোন সহান নেই।

আদর্শিক লিগ্যাসি ভিতর থেকে উজ্জীবিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্র গুলো কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয় গোলাম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য, উদাহরণ স্বরূপ আরব জাতীয়তাবাদের বদৌলতে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলো খ্রিস্টানরা গোলাম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করেছে। আরো অনেক মুসলিম স্খ্যা গরিষ্ঠ দেশ রয়েছে যা গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল গোলাম হিসেবে ব্যবহার করা।

এখন প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের আদর্শিক লিগ্যাসি কি? বাংলাদেশ তো দুইটি পৌত্তলিক সভ্যতার দ্বন্দ্বে বিজয়ী একটি দেশ যার অন্যতম লিগ্যাসি হল ১৯০৫ সালের মুসলিম স্খ্যা গরিষ্ঠ বে্গল আসাম প্রদেশ ।

ভাষা কখনো এদেশের লিগ্যাসি হতে পারে না, যদি ভাষাকে আপনি আদর্শের উপরে সহান দেন, তাহলে এদেশের অস্তিত্ব অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে।
কাজেই এদেশের অস্তিত্বের জন্য আদর্শিক লিগ্যাসি বহন করতে হবে আর এই আদর্শিক লিগ্যাসি হল ইসলাম তথা খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং নিকট অতীতের ১৯০৫ সালে ইসলামের ভিত্তিতে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ যার ভিত্তিতে মুসলিম জাতিসত্তার পদযাত্রা।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১৭

বিষয়:-রাষ্ট্র সমূহের গঠন ও অস্তিত্বের জন্য লিগ্যাসি একটি অপরিহার্য উপাদান।

পাঠক, রাষ্ট্র সমূহ গঠনের জন্য লিগ্যাসি একটি অপরিহার্য উপাদান। লিগ্যাসি ব্যাতিত কোন রাষ্ট্র গঠিত হলে তা অচিরেই বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে কোন রাষ্ট্র লিগ্যাসি বহন করলে তা শক্তিশালী হয় এবং আভ্যন্তরীণ ঐক্য সুদৃঢ় হয় যা আত্মরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক। উদাহরণ স্বরূপ, আজকের ইরান ভূখণ্ডগতভাবে প্রাচীন পারসিক সাসানী সাম্রাজ্যের লিগ্যাসি বহন করে এবং আদর্শিক ভাবে শিয়া সাফাভী সাম্রাজ্যের লিগ্যাসি বহন করার কারণে তারা বহিশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে নি

পক্ষান্তরে রাষ্ট্র যখন কোন লিগ্যাসি বহন না করে তখন তা গোলামে পরিনত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, আজকের মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলো ভূখণ্ডগত ও আদর্শিক কোন লিগ্যাসি বহন করে না। কৃত্রিম আছাবিয়্যাত তাদের মধ্যে পূর্ন মাত্রায় বিদ্যমান।আবার ইন্দোনেশিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ব তিমুর নামক যে রাষ্ট্র হয়েছে তা খ্রিস্টান লিগ্যাসি বহন করে। খ্রিষ্টান লিগ্যাসি বহন করার কারণে খ্রীষ্টীয় শক্তির সহায়তায় একটি খ্রীষ্টান রাষ্ট্র গঠন করতে সমর্থ হয়।

ভারতের সপ্ত কন্যা ও আমাদের বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে খ্রিস্টানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্বি পাওয়ার জন্য সেখানে একটি খ্রীষ্টান আদর্শিক লিগ্যাসি বহন কারী একটি রাষ্ট্র গঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। পাকিস্তান ভূখণ্ডগতভাবে সাবেক মোগল সাম্রাজ্যের লিগ্যাসি বহন করে এবং এর ভিত্তি মূল হল লাহোর প্রস্তাব যা ২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে গৃহিত হয় । কাজেই একটি রাষ্ট্রের ভিত্তি মূল ও লিগ্যাসি রাষ্ট্র গঠনের পূর্ব হতেই প্রস্তূত হয়ে থাকে।

এমনিভাবে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র ভূ খন্ড গত ভাবে বেংগল মুসলিম সালতানাতের আংশিক লিগ্যাসি বহন করে এবং আদর্শিকভাবে ইসলামী সভ্যতাকে ধারন করে। এই রাষ্ট্রের ভিত্তি মূল হল মুসলিম জাতিসত্তা যার ভিত্তিতে ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বেংগল আসাম প্রদেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এই ১৯০৫ সালের ধারাবাহিকতায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন, ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব সহ পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলী। বাংলাদেশের আদর্শিক লিগ্যাসি হল ইসলাম এবং ভূখণ্ডগত লিগ্যাসি হল বেংগল সালতানাত, ১৯০৫ সালের বেংগল আসাম প্রদেশ এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তান।
কাজেই বাংলাদেশ যে আদর্শিক লিগ্যাসি বহন করে তা যদি পরিত্যাগ করে তাহলে এদেশের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১৮
বিষয়:- বাংলাদেশ হল বিভিন্ন স্ঘাতের ফসল।

পাঠক, এখন আমি cl ash of ci vi l i zat i on, cl ass of gr oup f eel i ng এবং cl ash of i nt er est এই তিনটির দৃষ্টিকোন হতে ১৯০৫ সালের বে্গল আসাম প্রদেশের যথার্থতা সম্পর্কে আলোচনা করব।

পাঠক, সভ্যতার দ্বন্দ্বের মূল ধর্ম কেন্দ্রীক হয়ে থাকে, গোষ্ঠী প্রীতি হয়ে থাকে আত্ম রক্ষার ক্ষেত্রে এবং স্বার্থগত দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে অর্থনৈতিক কারনে। মানব সভ্যতার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করেন , তাহলে এই তিনটি দ্বন্দ্বের বাইরে আপনি অন্য কোন দ্বন্দ্ব পাবেন না।

সভ্যতার দ্বন্দ্বের দৃষ্টিকোন থেকে যদি দেখেন বৌদ্ধ ধর্ম কেন্দ্রীক বৌদ্ধ সভ্যতার দেশ হল বার্মা, ইসলামী সভ্যতা কেন্দ্রিক দেশ হল বাংলাদেশ এবং পৌত্তলিক প্রাধান্য সভ্যতার দেশ হল ভারত। বলতে গেলে বা্লাদেশ হল দুইটি অমুসলিম সভ্যতার মধ্যে ইসলামী সভ্যতার ধারক একটি দেশ। বাংলাদেশ হল সভ্যতার দ্বন্দ্বের এক অনিবার্য পরিণতি। কারণ আমার জানামতে পৃথিবীতে দুটি সভ্যতার মধ্যে তৃতীয় একটি সভ্যতার অস্তিত্ব নেই।
এই সভ্যতার দ্বন্দ্বের মূল ভিত্তি হল ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশের মাধ্যমে। কাজেই আপনি ১৯০৫ সালকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

এই রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি কখনো জাহেলী যুগের আছাবিয়্যাত নয় । এর মূল ভিত্তি হল সভ্যতার দ্বন্দ্ব এবং এই সভ্যতার দ্বন্দ্বের সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব যোগ হয়েছে। বস্তুত সভ্যতার দ্বন্দ্বের জন্য ১৯০৫ সালে মুসলমানদের জন্য আলাদা প্রদেশ হয় এবং তা ১৯১১ সালে সভ্যতার দ্বন্দ্বে বিজয়ী মুসলিম জাতিসত্তা স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে সাময়িক ভাবে পরাজিত হয় । অবশ্য ১৯৪৭ সালে সভ্যতার দ্বন্দ্বে আবার মুসলিম জাতিসত্তা বিজয়ী হয় ।

এরপর আসা যাক, গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা।

পাঠক, একই সভ্যতার মধ্যে গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের কারণে একাধিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ আরব জাহানের প্রায় সব রাষ্ট্র ইসলামী সভ্যতার ধারক বাহক, কিন্তু গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বের কারণে একাধিক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

এবার আমি স্বার্থের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে আলোচনা করব । সভ্যতার দ্বন্দ্ব হল যে কোন দ্বন্দ্বের বৃহত্তর রূপ। যেখানে সভ্যতার দ্বন্দ্ব থাকবে, সেখানে অধিকাংশ সময় গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকবে।

পাঠক, ১৯০৫ সালে ব্গ ভে্গর অন্যতম কারণ হলো স্বার্থগত দ্বন্দ্ব। কারণ কলকাতা কেন্দ্রীক হিন্দু শক্তির নিকট পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানদের ন্যায্য স্বার্থ নিরাপদ ছিল না। ফলে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্গভ্গ অপরিহার্য ছিল।

এই ভূখণ্ডে কখনো গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব অথাৎ আছাবিয়্যাত ছিল না। এই ভূখণ্ডে সভ্যতার দ্বন্দ্ব ছিল। যারা বাংলা ভাষাকে এদেশের ভিত্তি বলে তারা ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কে জাহেল । একটি রাষ্ট্রের গঠন ও স্থায়ীত্বের জন্য ভাষা কখনো ভিত্তি নয় , কাজেই আদর্শিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি মুসলিম ভূখন্ডকে ভাষা ভিত্তিক আছাবিয়্যাতের নামে পরাধীন করার পাঁয়তারা মাত্র।

কাজেই সভ্যতার দ্বন্দ্বে বিজয়ী ১৯০৫ হল এদেশের ভিত্তি মূল।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ১৯
বিষয়:- বে্গল আসাম প্রদেশের লিগ্যাসী।

পাঠক, আপনি ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, ধর্ম যে কোন দৃষ্টিকোন থেকে দেখতে পাবেন যে, বর্তমান বাংলাদেশ ১৯০৫ সালের মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশের লিগ্যাসী বহন করে এবং ১৯০৫ সাল হল এদেশের ভিত্তি মূল।
স্নায়ু যুদ্ধের আমলে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক এই দুইটি শিবিরে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সভ্যতার দ্বন্দ্ব আবার নতুন করে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশের অবস্থান দুইটি বৃহৎ সভ্যতার মাঝখানে। একটি হল বৌদ্ধ সভ্যতা এবং অপরটি হল ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতা। একদিকে বৌদ্ধ সভ্যতার দেশ বার্মা অপরদিকে হিন্দু সভ্যতার দেশ ভারত।

এমতাবস্থায় এই দেশ গঠনের মূল উপাদান কি ? কোন আছাবিয়্যাত এই দুইটি সভ্যতার মধ্যে একটি দেশ গঠন করেছে? উত্তর হল মুসলিম জাতিসত্তা। ভাষা ভিত্তিক জাতীয় সত্বা নয় । ভাষা ভিত্তিক জাতী সত্তাকে স্বীকার করে নিলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হত না।

ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রের কারনে বা্লাদেশের অস্তিত্ব আছে, নতুবা অস্তিত্ব থাকত না।

সভ্যতার দ্বন্দ্বে এই ভূখণ্ডে ইসলামী সভ্যতার বিজয় হবার কারণে দুইটি বৃহৎ সভ্যতার মধ্যে ইসলামী সভ্যতার ধারক বা্লাদেশ নামক একটি রাষ্ট্রের অবস্থান যা পূর্ব পাকিস্তানের লিগ্যাসি বহন করে। এই পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে। কাজেই মুসলিম জাতিসত্তাই হল এদেশের মূল উপাদান।

সভ্যতার দ্বন্দ্বের বিতর্কে যেহেতু বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি ইসলামী সভ্যতার ধারক বাহক, তাহলে এই রাষ্ট্রের লিগ্যাসি হল মুসলিম জাতিসত্তা যা ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ২০
বিষয়:- বাংলাদেশের কার্যকরী মূল উপাদান।

পাঠক, ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশের মূল উদ্দেশ্য কি ছিল এবং মূল উপাদান

কি ছিল এবং এই উপাদান কি এখনো কার্যকর?

১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানদেরকে হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচার হতে রক্ষা করা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ভাগ্য উন্নয়ন করা।

তাহলে এমন কি ঘটনা ঘটেছিল যা মুসলমানদেরকে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে একটি আলাদা প্রদেশ গঠন করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৭৫৭ সালের পলাশীর বিপর্যয় পর মুসলমানরা রাজত্ব হারা হয়ে যায় এবং মুসলমানরা হিন্দু জমিদার কর্তৃক নির্যাতিত হতে থাকে যা ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর বিবরণ রয়েছে।

১৯০৫ সাল ছিল মুসলমানদের বেঁচে থাকার অধিকারের রক্ষা কবচ যার ভিত্তি ছিল মুসলিম জাতিসত্তা ।

এতে হিন্দুত্ববাদীদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা আন্দোলন গড়ে তোলে এবং ১৯১১ সালে হিন্দুত্ববাদীদের আন্দোলন এর ফলে মুসলমানদের জন্য গঠিত প্রদেশের বিলুপ্তি ঘটে।

এই হিসেবে ১৯০৫ সাল হল এদেশের ভিত্তি মূল।

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ২১

বিষয়:- ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতিসত্তা পরস্পর বিরোধী।
ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতিসত্তা পরস্পর বিরোধী। ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ

মুসলমানদের জন্য পতনের অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে মুসলিম জাতিসত্তা মুসলিমদের নিরাপত্তার গ্যারান্টার।ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করা আবশ্যক।আমি মুসলিম জাতিসত্তার তিনটি ঐতিহাসিক উদাহরণ দিব ।প্রথম উদাহরণ হল স্পেনে মুসলিম জাতিসত্তার অবদান। পাঠক, স্পেনে উমাইয়া খিলাফতের পতনের পর সেখানে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল, ঐতিহাসিকগন এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোকে আলমুলকুত তাওয়ায়িফ নামে অভিহিত করে। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো এক সময় দূর্বল হয়ে পড়লে খ্রিস্টানদের আগ্রাসনের সম্মুখে পড়ে, এমতাবস্থায় উত্তর আফ্রিকার মোয়াহেদ ও মুরাবিত শাসকগন স্পেনের মুসলমানদেরকে খ্রিস্টানদের আগ্রাসন হতে রক্ষার জন্য বহু অভিযান পরিচালনা করে খ্রিস্টানদের আগ্রাসন হতে রক্ষা করে ।

দ্বিতীয় উদাহরণ হল ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে আরবরা ডাচদের আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়ে উসমানীয় সুলতান সেলিম এর সাহায্যে কামনা করে। সুলতান সেলিম আরবদের আহবানে সাড়া দিয়ে আরব ভূমিতে পদার্পণ করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে আরবরা খ্রিস্টানদের গোলামী হতে মুক্তি পায় । এই গুলো হল মুসলিম জাতিসত্তার অবদান।

তৃতীয় উদাহরণ হল , পূর্ব বাংলার মুসলমানরা যখন ইংরেজ ও হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল, তখন ১৯০৫ সালে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে হিন্দুদের অত্যাচার হতে মুক্ত হয়েছিল। আবার ১৯৪৭ সালে যখন অখন্ড বাংলার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তখন মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে কায়েদে আজমকে নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে হিন্দু ও ইংরেজদের কবল হতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠন করে।

পাঠক, স্পেনের মুসলিম শাসনের পতন হয় আছাবিয়্যাত এর কারণে , সেখানে আরব , বারবার, হিমারী , মুদারী আছাবিয়্যাত থাকার কারণে মুসলমানরা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। আবার আরবরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের কারণে ইহুদি খ্রিস্টানদের গোলামে পরিনত হয়েছে। আজ গাজার মুসলমানদের এই করুন পরিনতির জন্য দায়ী হল ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ।আবার যে পাকিস্তান মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল, সেখানে বা্গালী জাতীয়তাবাদ পাকিস্তান পতনের জন্য দায়ী। এই বা্গালী জাতীয়তাবাদের বলি হল এদেশের ইসলামী সভ্যতা ও বিহারী মুসলমানরা। বাংগালী জাতীয়তাবাদীরা বিহারীদের উপর গণহত্যা চালিয়েছে এবং তারা একটি মুসলিম দেশকে পৌত্তলিকদের পদতলে নিক্ষেপ করার সদা চেষ্টায় লিপ্ত।
চলমান,
মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ২২

বিষয়:- ভাষা ভিত্তিক জাতিসত্তা বাংলাদেশের গোলামীর কারন।

আবার একটি রাষ্ট্র গঠন ও পতনের ক্ষেত্রে ও মূল উপাদান এর প্রভাব থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, বিগত শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের মূল উপাদান ছিল।
সমাজতন্ত্রের পতন হলে এই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে।

কোন একটি রাষ্ট্রের মূল উপাদান যদি বিলুপ্ত হয় , তবে সেই রাষ্ট্র টিকতে পারবে না। এটি ঐতিহাসিক গত ভাবে সত্য। এর অন্যতম উদাহরণ হল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন।

মুসলিম দেশে এর উদাহরণ হল পাকিস্তান। পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে। অতঃপর উভয় পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতারা যখন ইসলামী আদর্শ পরিত্যাগ করে সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী হয়ে উঠে এবং মুসলিম জাতিসত্তার পরিবর্তে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারক বাহক হয়েছিল, তখনই পাকিস্তানের পতন ঘটে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যখন মুসলিম জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে বাংগালী জাতীয়তাবাদীরা দেশ পরিচালনা করে , তখন তা পৌত্তলিক শক্তির দাপট বেড়ে যায় এবং একটি মুসলিম দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার পথে চলে যায়।

সূতরা ্ বাংলাদেশের মূল উপাদান মুসলিম জাতিসত্তাকে অবজ্ঞা করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়।

এই মুসলিম জাতিসত্তার মূল ভিত্তি মূল হল ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে।

চলমান,

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ২৩

বিষয় :- ইসলামী দলগুলো মুসলিম জাতিসত্তার ব্যাপারে গাফেল ।

পাঠক, ইদানিং বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর অধিকাংশ নেতা কর্মী মুসলিম জাতিসত্তাকে অবহেলা করতেছে এবং মুসলিম জাতিসত্তাকে ইনিয়ে বিনিয়ে নাজায়েজ বলার চেষ্টা করে। এই সব লোকগুলো ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে জাহেল , ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে তাদের নূন্যতম ধারণা নেই। এদের অধিকাংশই মুসলিম জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে ইনিয়ে বিনিয়ে জায়েজ করতে চেষ্টা করে। এই নাদান গুলো ঈমানের সাথে সাওয়াবের নিয়তে নিজের অজান্তেই নিজের পেটে চুরি চালাচ্ছে।

এদের নিকট যদি প্রশ্ন করেন যে, বাগদাদের খিলাফত প্রতিষ্ঠা থাকাবস্থায় ৯২৭ সালে কি জন্য স্পেনের কর্ডোভায় তৃতীয় আব্দুর রহমানকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এদের অনেকেই এই বিষয়টি জানেই না।

এই নাদান গুলোর নিকট পৌত্তলিক গান্ধী কায়েদে আজম হতে অনেক ভাল। এরা গান্ধীর তারিফ করবে আর জিন্নাহকে গালিগালাজ করবে। যদি জিন্নাহ না হত , তাহলে এই নেমকহারামিরি ফতোয়ার কিতাব পড়ার তো দূরের কথা, হিন্দুদের গোশালায় গোলামী করে জীবন কাটাত ।

বস্তুত এই বা্লাদেশ হল সভ্যতার দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি। একে যদি ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা অখন্ড ভারত ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উপর দাড় করানোর চেষ্টা করে , তাহলে এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।আর এই সভ্যতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় ১৯০৫ সালে। কাজেই এখানে অঞ্চলভিত্তিক অখন্ড ভারত জাতীয়তাবাদ বা ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সুযোগ নেই, যা ১৯৪৭ সালের বহু পূর্বে ১৯০৫ সালেই ভিত্তি মূল স্থাপিত হয়েছে।

অনেক জাহেল কয়েকটি চটি বই পড়ে মুসলিম জাতিসত্তাকে আছাবিয়্যাত এর সাথে তূলনা করে এবং হারাম মনে করে। অথচ এদেশ আছাবিয়্যাত দ্বারা গঠিত হয় নি, এই দেশ হল সভ্যতার দ্বন্দ্বের অনিবার্য ফসল যা ইসলামের বিজয় বহন করে। কাজেই বাংলাদেশের মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী সভ্যতা সমার্থক যা বর্তমান বিশ্বের কোথাও আপনি দেখতে পাবেন না।

চলমান,

মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ২৪

বিষয়:- রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদান বিলুপ্ত হলে রাষ্ট্রের পতন প্রাকৃতিক ভাবে ঘটে ।

পাঠক, এই পর্বে আমি রাষ্ট্র গঠনের উপাদান এবং উপাদান বিনষ্ট হলে রাষ্ট্র বিলীন সম্পর্কে আলোচনা করব।
পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিজ্ঞান মোতাবেক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে আদর্শের তেমন কোন ভূমিকা নেই। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামো জনগনকে ভোগবাদের দিকে ধাবিত করে। অথচ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গত শতাব্দীতে দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। একটি হল সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অপরটি হল পাকিস্তান। সোভিয়েত ইউনিয়ন নামক রাষ্ট্রের মূল উপাদান ছিল সমাজতন্ত্র, পাকিস্তানের মূল উপাদান ছিল মুসলিম জাতিসত্তা।

পাকিস্তানের মূল উপাদান মুসলিম জাতিসত্তার জন্মস্থান হল ঢাকা যা ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে শুরু হয়।

পূর্ব বাংলার মুসলমানরা সব সময় মুসলিম জাতিসত্তা বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের যে কোন এলাকার মুসলমানদের অপেক্ষা বেশি অবদান রেখেছে । ১৯৪০ সালে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের জন্য যিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন তিনি হলেন পূর্ব বাংলার শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, এমনকি লাহোর প্রস্তাবের উর্দু খসড়া যিনি প্রস্তুত করেছিলেন তিনিও হলেন সাবেক আসাম প্রদেশ বর্তমান সিলেটের মাওলানা আতহার আলী।

অপরদিকে বর্তমান পাকিস্তানের অনেক নেতা মুসলিম জাতিসত্তা ধারন করতেন না, উদাহরণ স্বরূপ সীমান্ত গান্ধী , গান্ধীবাদে বিশ্বাসী হুসাইন আহমদ মাদানীর এক শিষ্য বলেছেন যে, হে আল্লাহ, পাকিস্তান করার মধ্যে যে পাপ হয়েছে, এই পাপের মধ্যে আমি নেই। এই হল পাকিস্তানে মুসলিম জাতিসত্তার অবস্থা।

পাঠক, গত শতকের নব্বইয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ পতন হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে, ঠিক তেমনি পাকিস্তানের শেষ দিকে আইউব খানের শাসনামলে উভয় পাকিস্তানে মুসলিম জাতিসত্তার পরিবর্তে সেক্যুলার শক্তির উদ্ভব এবং পূর্ব পাকিস্তানে সেক্যুলার ও বাংলা ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটলে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানের পতন ঘটে। কাজেই এই বিষয়টি প্রমাণিত যে, রাষ্ট্র গঠনের মূল উপাদানের বিলুপ্তির সাথে সাথে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। যদি বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের মূল উপাদান মুসলিম জাতিসত্তা বিলুপ্ত ঘটলে এদেশের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এই মুসলিম জাতিসত্তার উম্মেষ হল ১৯০৫ সালে। কাজেই বাংলাদেশের ভিত্তি মূল হল ১৯০৫,

চলমান,
মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ২৫
বিষয়:- এদেশের মুসলিম জাতিসত্তা বিগত শতাব্দীর মুসলমানদের রাহবার ।
পাঠক, ১৯০৫ সালে পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ হল এমন একটি ঘটনা যা ভারতীয় মুসলমানদের মাইল ফলক। ১৯০৫ সালের সূত্র ধরে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন দুটি এক সূত্রে গাঁথা।

পাঠক, আপনি লক্ষ্য করুন যে, যে বাংলার মাটিতে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিম রিয়াসাতের পতন হয়েছিল এবং পর্যায়ক্রমে সারা ভারত হতে মুসলিম রিয়াসাতের পতন হয় সেই বাংলাকে কেন্দ্র করে আবার ভারতীয় মুসলমানরা তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন করে।

পাঠক, আপনি আরো লক্ষ্য করবেন যে, পলাশীর যুদ্ধের ষড়যন্ত্র এই ঢাকায় করা হয়েছিল, সেই ঢাকাকে আবার কেন্দ্র করে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে বে◌্গল আসাম প্রদেশ গঠন, তৎপর ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠন এবং এর পরবর্তী ইতিহাস মুসলমানদের রিয়াসাত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। কাজেই ১৯০৫ সাল হল এদেশের ভিত্তি মূল।

১৯০৫ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মুক্তির সনদ হলেও বস্তূত এটি ছিল ভারতীয় মুসলমানদের রিয়াসাত উদ্ধার করার প্রথম ধাপ। তাই ১৯০৫ শুধু বাংলার নয় উপমহাদেশের মুসলমানদের পূনজাগরনের প্রথম ধাপ।
সমস্ত ভারত যদি অখন্ড থাকত, তাহলে ও পূর্ব বাংলা নামক মুসলমানদের আলাদা একটি দেশ অপরিহার্য ছিল।
কিছু ঐতিহাসিক বাস্তবতার অবতারণা প্রয়োজন?
১. পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে মুসলমানদের আলাদা একটি প্রদেশ গঠিত হয়েছে এটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

২. সৈয়দ আহমদ, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী , নবাব সলিমুল্লাহ ও অন্যান্য মুসলিম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের চাওয়া মুসলমানদের আলাদা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম মুসলিম লীগ ১৯০৬ সালে ১৯০৫ সালের সূত্র ধরেই হয়েছিল।
৩. ১৯০৫, ১৯০৬ এর সূত্র ধরে ১৯৪৭ অতঃপর বাংলাদেশের আবির্ভাব এই বিষয়টি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা।
৪. বাংলাদেশ যদি মুসলিম অধ্যুষিত না হত , তাহলে এটা ভারতের অ◌্শ হত। এটি ঐতিহাসিক সত্য।

তাহলে বাংলাদেশের অস্তিত্বের একমাত্র উপাদান হল মুসলিম জাতিসত্তা।
এমতাবস্থায় ১৯০৫ কে অস্বীকার করার অর্থ হলো বাংলাদেশের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা।

চলমান, তারিখ ----
মুসলিম জাতিসত্তা এবং ১৯০৫ সালই হল বাংলাদেশের ভিত্তি মূল, পর্ব ২৬
বিষয়:- ভাষা ভিত্তিক জাতিসত্তা এদেশের অস্তিত্বের জন্য হুমকি।

পাঠক, যখন এদেশে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদীরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন ইসলামী সভ্যতার

পতন ঘটে এবং এদেশের মুসলমানরা পৌত্তলিকদের গোলামে পরিনত হয়।

বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের স্বার্থে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ও ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সমর্থক দলকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

এই বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত যে, বাংলাদেশ হল পৌত্তলিক প্রভাবিত ভারতীয় সভ্যতা ও বৌদ্ধ সভ্যতার দ্বন্দ্বে বিজয়ী ইসলামী সভ্যতার দেশ যার মূল উপাদান হল মুসলিম জাতিসত্তা। মুসলিম জাতিসত্তা না থাকলে এদেশে ইসলামী সভ্যতার বিজয় সম্ভব ছিল না। এই মুসলিম জাতিসত্তার মূল ভিত্তি মূল হল ১৯০৫ সালে মুসলিম স্খ্যাগরিষ্ট বে্গল আসাম প্রদেশ গঠনের মাধ্যমে যার ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান অতঃপর বাংলাদেশ । সূতরা্ এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য বাংলাদেশ নামক একটি রাষ্ট্র আবশ্যক আর বা্লাদেশ নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য মুসলিম জাতিসত্তা আবশ্যক। কাজেই মুসলিম জাতিসত্তার বিপরীতে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে পরিহার করা আবশ্যক।

বস্তুত এই বা্লাদেশ হল সভ্যতার দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি। একে যদি ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা অখন্ড ভারত ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উপর দাড় করানোর চেষ্টা করে , তাহলে এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

আর এই সভ্যতার দ্বন্দ্ব শুরু হয় ১৯০৫ সালে। কাজেই এখানে অঞ্চলভিত্তিক অখন্ড ভারত জাতীয়তাবাদ বা ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবা

চলমান,

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ০১.

বিষয় '- ভূমিকা।

পাঠক, পাকিস্তান নাম শুনলেই অনেক বা্লাদেশের অনেক মুসলিম ঘৃনাভরে বাজে মন্তব্য করে। পাকিস্তানের প্রতি এই ঘৃনা মূর্খতার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম পাকিস্তান সৃষ্টির অপরিহার্যতার ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত না থাকায় তারা নিজেদের পূর্ব পূরুষদের অর্জিত একটি বিষয় কে বিসর্জন দিয়ে

ভারতের গোলামীর পথ বেচে নিয়েছে।

পাঠক, বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর ভারতীয় আগ্রাসনের অন্যতম কারণ হলো এদেশের অধিকাংশ মুসলমান মুসলিম জাতিসত্তা ও পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে অবগত নয় । ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির অপরিহার্যতা সম্পর্কে জানা আবশ্যক। পাকিস্তান সৃষ্টির আবশ্যকতা সম্পর্কে আপনি অবহিত না হলে আপনি নিজের অজান্তেই ভারতের দালাল হয়ে যাবেন ।

পাঠক, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছেন, পাকিস্তান কোন দেশের নাম নয় , পাকিস্তান হল একটি আদর্শ যে আদর্শ ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তির আগ্রাসন মোকাবেলায় মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক। আপনি লক্ষ্য করবেন যে, বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ভারতের সেবা দাস আওয়ামী লীগের শাসনামলে পাকিস্তানী হিসেবে আখ্যায়িত করত। জিয়াউর রহমানকে পাকিস্তানের চর হিসেবে আখ্যায়িত করত । বাংলাদেশে যারা হিন্দুত্ববাদী শক্তির আধিপত্য মেনে নিতে নারাজ তাদেরকে হিন্দুত্ববাদী শক্তি পাকিস্তানী অথবা পাকিস্তানের চর অথবা পাকিস্তানের দালাল হিসেবে আখ্যায়িত করে। হিন্দুত্ববাদী শক্তি যাদেরকে পাকিস্তানী অথবা পাকিস্তানের দালাল বলে আখ্যায়িত করে তারাই হল প্রকৃত দেশ প্রেমিক। এই হিসেবে বেগম জিয়া ও জিয়াউর রহমান খাটি দেশপ্রেমিক।

পাঠক, দেশপ্রেমিক জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও পাকিস্তানের চর বা পাকিস্তানের দালাল হিসেবে আখ্যায়িত হবার কারন হল জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া কখনো ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের সাথে আপোষ করে নি । পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও একজন মুসলিম পাকিস্তানী যদি সে ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তির আধিপত্য মেনে না নেয় । এতে স্পষ্ট যে, পাকিস্তান কোন দেশের নাম নয়, পাকিস্তান হল মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য স্গ্রামের একটি পতাকা বা আদর্শের নাম।

পাঠক, পাকিস্তানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খোদ শেখ মজিবুর রহমান বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি জীবিনে কোন দিন পাকিস্তানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে অস্বীকার করে নি । পাকিস্তান ছিল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মুক্তির মহা সনদ। পাকিস্তানের সৃষ্টির মূল কারিগর হল পূর্ব বাংলার মুসলমানরা, ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠিত হয়, অতঃপর ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে লাহোর প্রস্তাব হয় -- এই লাহোর প্রস্তাব পূর্ব বাংলার মুসলমান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেব করেছেন। ১৯৪৬ সালে বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানের পক্ষে নির্কুশ ভোট দেয় ।

অপরদিকে বর্তমান পাকিস্তানের তৎকালীন নেতাদের ভূমিকা পাকিস্তান সৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের তূলনায় খুবই কম যা ১৬ ভাগের এক ভাগ হবে কি না সন্দেহ আছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে

পাকিস্তানের পক্ষের লোকদের ধরে পিঠানো হত । পাকিস্তানের অন্যান্য অংশের লোকদের অনেকেই ফতোয়া সহকারে ঈমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে পাকিস্তানের বিরোধীতা করে। তৎকালীন একজন পাকিস্তানি মাওলানা বলেছিলেন , ইয়া আল্লাহ পাকিস্তান কায়েম কারনে মে জু গুনাহ হায় , উসমে ম্যায় শামীল নেহী , মূজে মাফি ফরমা , অথাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে যে গুনাহ হয়েছে এর মধ্যে আমি নেই, হে আল্লাহ আমাকে মাফ কর । এই হল পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের অবস্থা। অপরদিকে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খান ছিলেন ভারতীয়। ১৯৪৭ সাল হতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তানকে শাসন করে। বস্তুত বর্তমান পাকিস্তান হল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অবদান।

এত কিছুর পরও পাকিস্তানের সৃষ্টির অপরিহার্যতা সম্পর্কে ইতিহাস না জানার কারণে বাংলাদেশের মুসলমানরা বার বার ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের শিকার হয় ।

পাঠক, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এক হওয়া সম্ভব নয়। এটি কল্পনা বিলাস মাত্র এবং বাস্তবতা বিবর্জিত একটি কল্পনা। কিন্তু আমাদের পূর্ব পূরষগন কি জন্য নিজেদের জান মাল বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তান করেছেন, এর ইতিহাস জানা আবশ্যক। যদি ও পাকিস্তান কুরআন ও সুন্নাহর হতে দূরে সরে যাবার কারণে পতন ঘটে।

পাকিস্তানের অপরিহার্যতা ও পতনের কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক, নতুবা বাংলাদেশ নামক মুসলিম রাষ্ট্রটি বারবার ভারতীয় আগ্রাসনের শিকার হবে। যারা নিজেদের ইতিহাস জানে তারা বার বার পরাজিত হয় । আমি পর্ব আকারে পাকিস্তান সৃষ্টির অপরিহার্যতা সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করব , ওমা তাওফিকী ইল্লা বিল্লাহ

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ০2
বিষয়:--- মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব শূন্যতা পূরণের জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।

পাঠক, মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। হযরত আবুবকর রা. হতে খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আবর্তিত হয়েছে। খিলাফত তথা মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল

মুসলমানদের অভিভাবক। মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূমিকার উপর মুসলমানদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আপনি দেখতে পাবেন যে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দারুল খিলাফত যখন শক্তিশালী ছিল, তখন মুসলমানরা অমুসলিম আগ্রাসনের শিকার হয় নি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দূর্বলতার ফলে মুসলমানদের বহু খেসারত দিতে হয়েছে। তাই মুসলমানদের ঐক্য, মুসলমানদের অস্তিত্ব ও মুসলমানদের স্বার্থের জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা দারুল খিলাফত এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পাঠক, মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ডি জুর ও ডি ফেক্টো ভাবে হল খিলাফত ব্যবস্থা তথা দারুল খিলাফত । আইনত ও কার্যত উভয় দিক থেকে খলিফাই হলেন মুসলমানদের নেতা এবং খিলাফত হল মুসলমানদের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ডি জুর ও ডি ফেক্টো অথাৎ আইনত ও কার্যত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়।

পাঠক, ১৯২৪ সালে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পতনের পর মুসলমানগণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মারাত্মক অভাব বোধ করতেছিল । মুসলমানদের অস্তিত্ব, স্বার্থ ও অধিকারের পক্ষে বলার কোন রাষ্ট্র পৃথিবীতে ছিল না। খিলাফত পতনের পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সগর্বে এক খ্রিস্টান স্সদ সদস্য বলেছেন "' খিলাফত ব্যবস্থার বিলুপ্তির মাধ্যমে আমরা মুসলমানদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছি , তারা আর দাঁড়াতে পারবে না " । এতেই অনুমেয় যে, খিলাফত ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য কতটা আবশ্যক।

বস্তুত উসমানীয় খেলাফতের পতনের পর মুসলমানদের মধ্যে নেমে আসে ভয়াবহ হতাশা। খলিফা শূন্য পৃথিবীতে মুসলমানরা ছিল দিকভ্রান্ত। এমন হতাশা ইতিপূর্বে ইসলামের ইতিহাসে আসেনি।খিলাফত শূন্য পৃথিবীতে যে দুই জন মহামানব সবচেয়ে বেশি বিচলিত ছিলেন তিনি হলেন আল্লামা ইকবাল ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী গাওহার।

১৯২৪ সালে খিলাফত পতনের পর মুসলমানরা হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হইল। আমাবশ্যা রজনীতে মহাসাগরে দিশেহারা জাহাজের ন্যায় গন্তব্যহীন, নেতৃত্বহীন , রাজ্য হীন মুসলমানরা বলতে পারত না যে , পৃথিবীতে মুসলমানদের একটি দেশ রয়েছে, মুসলমানদের আশ্রয়ের সহান রয়েছে। অতঃপর ১৯২৮ সালে আল্লামা ইকবাল আওয়াজ তুললেন যে, মুসলমানদের একটি দেশ আবশ্যক। হতাশাগ্রস্থ মুসলমানদের মনে আশা সঞ্চার হল যে, মুসলমানদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আরেকটি রাষ্ট্র তৈরি করতে হবে।

অবশেষে মহাকবি ইকবাল এর স্বপ্ন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর সুযোগ্য নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের রিয়াসাত হিসেবে পাকিস্তান বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয়। পাকিস্তান জন্মের পর যে কয়েক বছর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রেখেছে , ততদিন মুসলমানদের ডিফেক্টো কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে পরিগণিত ছিল। পাকিস্তান যেই নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ বিসর্জন দিয়ে আমেরিকার ব্লকে চলে যায়, তখন

পাকিস্তান মুসলমানদের ডি ফেক্টোর নেতার মর্যাদা হারিয়ে একটি সাধারণ রাষ্ট্র হিসাবে পথ চলা শুরু করে।

পাকিস্তান মুসলমানদের ডি জুর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না হলেও ডি ফ্যাক্টো মুসলমানদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গন্য করা যেতে পারে। কারণ ডি জুর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। পৃথিবীর মুসলমানদের ডি ফেক্টো কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের জন্য পাকিস্তান তৈরি করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক ছিল এবং তখনকার মুসলিমরা এই বিষয়টি অনুধাবন করেই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল।
মুসলমানদের ডি ফেক্টো নেতৃত্বের জন্য পাকিস্তান তৈরীতে সব মুসলিম অংশগ্রহন করে, যদিও তারা জানত যে তাদের ভূখণ্ড পাকিস্তানের অংশ হবে না।
তাই মুসলমানদের কার্যত নেতৃত্বের জন্য পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের গঠন অপরিহার্য ছিল।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা পর্ব ০৩
বিষয়:-- মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র ভূমির জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।

পাঠক, ইসলামের সামগ্রিক ইতিহাস সম্পর্কে যদি অবগত না থাকে, তাহলে পাকিস্তানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কেহ অনুধাবন করতে পারবে না। পাকিস্তান নিছক একটি ভূখণ্ড নয় , এটি কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষা বা
সংগ্রামের ফসল নয়, বরং এই পাকিস্তান হলো পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ফসল এবং

ভারতীয় মুসলমানদের দীর্ঘ দুই শত বছরের সংগ্রামের ফসল ।

১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর মুসলমানরা ছিল রাজ্য হীন। ইন্দোনেশিয়া হতে মরক্কো পর্যন্ত কোন মুসলিম এলাকা স্বাধীন ছিল না। হাতে গোনা যে দুই তিনটি মুসলিম নামধারী রাষ্ট্র ছিল তা ছিল পাশ্চাত্যের তৈরিকৃত এবং তাদের গোলাম এবং এসব রাষ্ট্রগুলোর কোন শরয়ী বৈধতা ছিল না। মুসলমানরা বলতে পারত না যে, ইয়ে হামারা ওয়াতান হায় , অথাৎ এটি আমাদের দেশ ।

পাঠক, ১৯২৪ সালের পর মুসলমানদের মধ্যে কি পরিমান হতাশা নেমে এসেছিল তা কল্পনারও বাইরে। উসমানীয় খিলাফত পতনের পর মুসলমানদের হতাশার বর্ননা আমি একজন প্রবীণ মুসলমানের নিকট শুনেছি যিনি তরুণ বয়সে খেলাফত আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে এসেও তিনি খিলাফত আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতেন এবং সেই সময়ে মুসলমানদের মধ্যে চরম হতাশার কথা ব্যক্ত করেন।

পাঠক, ইসলামের ইতিহাসে ১৯২৪ সালের পর মুসলমানরা এক করুন অবস্থায় নিপতিত হয় যা ইতিপূর্বে মুসলমানরা প্রত্যক্ষ করে নি । মধ্যযুগে মো্গল আক্রমণের সময় ও মুসলমানরা এমন করূন অবস্থায় নিপতিত হয় নি। মো্গলদের আক্রমণে মধ্য এশিয়া ও এশিয়ার মুসলিম রিয়াসাত গুলো তছনছ হয়ে গেলেও তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য মিশরের মামলুক সালতানাত ও ভারতের মামলুক সালতানাত যথেষ্ট ছিল। মধ্য এশিয়া হতে মো্গল আক্রমণ থেকে বেঁচে যাওয়া অনেক মুসলিম ভারত ও মিসরের মুসলিম রিয়াসাতে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর অমুসলিম শক্তির আগ্রাসন মোকাবেলায় কোন মুসলিম রিয়াসাত ছিল না এমনকি অসহায় মুসলমানদের আশ্রয়ের জন্য কোন সহান ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের একটি রিয়াসাত আবশ্যক ছিল।

১৯২৮ সালে আল্লামা ইকবাল আওয়াজ তুললেন যে, পৃথিবীতে যেহেতু মুসলমানদের কোন রিয়াসাত নেই, তাই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে কেন্দ্র করে একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইকবালের সেই স্বপ্ন ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পূরন হয় । পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীর মুসলমানরা বলতে পেরেছে যে পাকিস্তান মুসলমানুকা ওয়াতান হায়।

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সারা পৃথিবীর মুসলমানরা একটি মুসলিম রিয়াসাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেছিল । এই অপেক্ষার প্রহর অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগষ্ট সমাপ্তি টেনে খিলাফত পতনের পর প্রথম মুসলিম রিয়াসাত হিসেবে পাকিস্তান বিশ্বের মানচিত্রে জায়গা করে নেয়।

কাজেই রাজ্য হীন, আশ্রয় হীন মুসলমানদের জন্য একটি রিয়াসাত আবশ্যক ছিল, আর এই আবশ্যকতা পূরনের জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা ছিল অনস্বীকার্য।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা পর্ব ০৪
বিষয়:-- ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।

পাঠক, কি জন্য আমাদের পূর্ব পূরষগন নিজেদের জান মাল বিসর্জন দিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই ইতিহাস জানা আবশ্যক। পাকিস্তান সৃষ্টির অপরিহার্যতা সম্পর্কে আপনি না জানলে ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তির আগ্রাসনের সম্মুখীন হতে বাধ্য। কারণ যারা নিজেদের পূর্ব পূরুষদের ইতিহাস না জানে, তাদের ললাটে গোলামীর টিকা থাকবে । পাকিস্তান ও বাংলাদেশ এক হওয়া সম্ভব নয়। এক হওয়ার

কল্পনা করাও ভূল এবং কল্পনা বিলাস মাত্র। কিন্তু পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হত না, এই বিষয়টি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। কাজেই এদেশের অস্তিত্বের জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

পাঠক, ভারতে মুসলিম শাসন অবসানের পর হিন্দুত্ববাদী শক্তির উত্থান মুসলমানদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে দেয় । ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হিন্দুত্ববাদী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত , কারণ ভারতের দুই তৃতীয়াংশের বেশি জনগোষ্ঠী ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। স্বাভাবিক ভাবেই মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। স্খ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুত্ববাদী শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কোন আইন পাশ করে মুসলমানদের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলে দিত। যেমনিভাবে ২০১৯ সালে হিন্দুত্ববাদী শক্তি কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নেয়। এন আর সি এর মাধ্যমে পূর্ব ভারতের মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিচ্ছে।

আবার রাষ্ট্রীয় মদদে মুসলমানদের নিধন কর্মসূচি অব্যাহত থাকত । যেমনটি এখন ভারতে চলছে। মুসলমানদের নাগরিক স্বাধীনতা সেখানে থাকত না। হিন্দুত্ববাদী শক্তি ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্বকে সহ্য করতে পারত না। তারা মুসলমানদেরকে ভারত ছেড়ে আরবের খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নেয়ার জন্য বলত । আমার নিকট কয়েক জন প্রবীণ মুসলিম স্থানীয় নেতা বর্ননা করেছেন যে, হিন্দুত্ববাদী শক্তি মুসলমানদেরকে আরবের খেজুর তলায় পাঠাবে মর্মে হুমকি দিত ।

ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তির অত্যাচার এবং মুসলমানদের প্রতি তাদের ঘৃন্য মনোভাব দিবালোকের মতো স্পষ্ট। অখন্ড ভারতে মুসলমানরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হত, ফলে মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। অখন্ড ভারতে সব সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগেই থাকত, হিন্দুরা স্খ্যাগরিষ্ট হবার কারণে মুসলমানরা সব সময় মার খেত। অখন্ড ভারতে হিন্দুরা স্খ্যা গরিষ্ঠ হবার কারণে মুসলমানদের অস্তিত্ব সব সময় তাদের দয়ার উপর নির্ভর করত। স্খ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কোন আইন পাশ করে মুসলমানদেরকে বিপদে ফেলে দিত । যেমনটি ১৯৪৭ সালের পর থেকে পরিলক্ষিত হয়। অথাৎ মুসলমানদের অস্তিত্ব, মুসলমানদের স্বার্থ অখন্ড ভারতে নিরাপদ ছিল না। মুসলমানরা অখন্ড ভারতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে হত , যেমনটি এখন ভারতে দেখা যায়।

হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসনের অসহায়ত্বের মুখে মুসলমানরা একটি মুসলিম রিয়াসাতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে । লাহোর প্রস্তাব এর একটি জলন্ত উদাহরণ। পাকিস্তান না হলে মুসলমানরা স্খ্যালঘু হিসেবে সব সময় হিন্দুদের দ্বারা শাসিত হত ।

ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হবার আশঙ্কা শুধু মুসলমানদের ছিল না। হিন্দুত্ববাদী শক্তি

দ্বারা নির্যাতিত দলিতদের নেতা ও ভারতীয় স্ বিধানের প্রবক্তা আম্বেদকর নিজে এই আশ্কা ব্যাক্ত করে পাকিস্তানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তব্য রাখতেন।

মুসলমানদের মৌলিক অধিকার বলতে কিছুই থাকত না। এমতাবস্থায় ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য একটি আলাদা মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল। পাকিস্তান সেই আবশ্যকতাকে অনেকটা পূরন করেছে। কাজেই মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য , মুসলমানদের স্বার্থের জন্য এক বা একাধিক মুসলিম রিয়াসাতের প্রয়োজনীয়তা ছিল যা পাকিস্তানের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে । বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশ পাকিস্তান আন্দোলনের ফসল।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ০5
বিষয়:- উচ্চ বর্নের হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচারের কবল থেকে বৌদ্ব ও নিম্ন বর্নের হিন্দুদের রক্ষার জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।

পাঠক, মুসলিম শাসন মজলুম মানুষের জন্য মুক্তির মহা সনদ । মুসলিম শাসন পতনের পর মানবতার পতন ঘটেছে। একবি্শ শতাব্দীর মহান বুজুর্গ সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী তার " মুসলমানদের পতনে

বিশ্ব কি হারাল" , মানব সভ্যতার জন্য মুসলিম শাসন কতটুকু আবশ্যক তা অনুধাবন করা যায়। হিন্দুত্ববাদী শক্তি শুধু মুসলমানদের জন্য হুমকি নয় , বরং নিম্ন বর্নের হিন্দুদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। নিম্ন বর্নের হিন্দুরা সব সময় উচ্চ বর্নের হিন্দুত্ববাদী শক্তি দ্বারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত। মুসলিম শাসনে নিম্ন বর্নের হিন্দুরা উচ্চ বর্নের হিন্দুদের দ্বারা কিছু কম নির্যাতিত ছিল। এজন্য নিম্ন বর্নের হিন্দুরা তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য একটি মুসলিম রিয়াসাতের আশা করেছিল এবং এটিই স্বাভাবিক।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতীয় মুসলিম শাসকদের কারনে উচ্চ বর্নের হিন্দুত্ববাদী শক্তি নিম্ন বর্নের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করার সাহস করে নি । তাই নিম্ন বর্নের হিন্দুরা মুসলমানদের আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল ছিল। মুসলিম লীগ নিম্ন বর্নের হিন্দুদের আশ্রয় দিয়েছিল।

ভারতের স্ বিধান প্রনেতা আম্বেদকর ছিলেন একজন নিম্ন বর্নের হিন্দু । তাকে উচ্চ বর্নের হিন্দুরা সব সময় কোনঠাসা করে রাখত । আম্বেদকর উচ্চ বর্নের হিন্দুত্ববাদী শক্তির মোকাবেলায় তিনি মুসলমানদের নিকট আশ্রয় নেয় এবং মুসলিম লীগের সহায়তায় তিনি স্সদ সদস্য হন এবং দিল্লির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন । হিন্দুত্ববাদী শক্তি কখনো একজন দলিতকে মন্ত্রী হিসেবে সহ্য করে নি ।

মুসলমানদের এই বদান্যতা নিম্ন বর্নের হিন্দুরা মুসলিম রিয়াসাতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ১৯৪৬ সালে সিলেটের রেফারেন্ডামে নিম্ন বর্নের হিন্দুরা পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়। দলিত নেতা যোগেন মন্ডল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন ।

অনুরূপ ভাবে উপজাতিরা একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব ছিল। নিম্ন বর্নের হিন্দু ও উপজাতিদের ভয় ছিল যে, তারা উচ্চ বর্নের হিন্দুত্ববাদী শক্তির অধীনে নিষ্পেষিত হবে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছে।

দলিত হিন্দু নেতা আম্বেদকর পাকিস্তানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তব্য দিতেন। বস্তুত নিম্ন বর্নের হিন্দুদের জন্য উচ্চ বর্নের হিন্দুত্ববাদী শাষন অপেক্ষা পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ০৬
বিষয়:-- মজলুম মুসলমানদের সহায়তার জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা

পাঠক, উসমানীয় খিলাফতের পতনের পর মুসলমানদের সহায়তা কারী কোন দেশ অবশিষ্ট রইল না। সারা বিশ্বের মুসলমানদের একটি অপেক্ষা ছিল যে, পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠিত হবে যা মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য একটি শক্তিশালী মুসলিম

রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল যে রিয়াসাত সারা পৃথিবীর অসহায় মুসলমানদের পাশে দাঁড়াবে।

এমতাবস্থায় মোগল সাম্রাজ্যের লিগ্যাসি হিসেবে ভারতে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় যে তার জন্ম লগ্ন থেকেই পৃথিবীর মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ইহুদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে আরব মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়েছে।
১৯৬৭ সালে পাকিস্তানী বাহিনী আরব মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়ে ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এর মধ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বৈমানিক সাইফুল ইসলাম এর বীরত্ব বিমান যুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।এক পাকিস্তান ভেঙ্গে দুই পাকিস্তান হবার পরও বর্তমান বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করে। ১৯৯১ সাল হতে আজারবাইজান এর একটি বিশাল এলাকা আর্মেনিয়া জোর পূর্বক দখল করে রাখে। অবশেষে ২০২২ সালে পাকিস্তানী বাহিনী আর্মেনিয়াকে উচ্ছেদ করে নাগানো কারবাক এলাকায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করে ।

১৯৭৯ সালে যখন সোভিয়েত রাশিয়া আফগানিস্তানে অভিযান পরিচালনা করে লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে গণহত্যা চালায়, তখন আফগানিস্তানের মুসলমানরা পাকিস্তানের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পাকিস্তান আফগানিস্তানের মুসলমানদেরকে সাধ্যমত সহায়তা করে । যদি পাকিস্তান না হত, আফগানিস্তানের মুসলমানরা কোথায় আশ্রয় নিত?

পাঠক, ১৯৪৭ সাল থেকে অদ্যাবধি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তান সামরিক শক্তি দিয়ে সহায়তা করেছে, বাংলাদেশ সামরিক শক্তি দিয়ে সহায়তা করার সক্ষমতা না থাকলে ও কুটনৈতিকভাবে মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়েছে।
যদি পাকিস্তান না হত , তাহলে বাংলাদেশ হত না। যদি বাংলাদেশ না হত তাহলে অখন্ড ভারতের অধীনে থেকে বাঙ্গালী মুসলমানদের পক্ষে পৃথিবীর মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানো সম্ভব ছিল না।

কাজেই খিলাফতের অবর্তমানে সারা পৃথিবীর মজলুম মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা ছিল যা বর্তমানে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ যথাসম্ভব পালন করার চেষ্টা করে।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ০৭
বিষয়:-- আরাকান ও পূর্ব ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।

পাঠক, পূর্ব ভারত ও আরাকানের মুসলমানদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের জন্য একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল। এজন্য পূর্ব ভারতের ঢাকায় মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশ ও একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা করার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়।

অখন্ড পাকিস্তান একটি শক্তিশালী মুসলিম রিয়াসাত হওয়ার কারণে বার্মার আরাকানের মুসলমানদের নিরাপত্তা ছিল। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আরাকানের মুসলমানদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দ্বি খন্ডিত হলে বাংলাদেশ নামক একটি দূর্বল রাষ্ট্র আরাকানের মুসলমানদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের দূর্বলতার সুযোগে ১৯৭৯ সালে আরাকানের মুসলমানদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয় এবং সেখান থেকে মুসলিম নিধন ও বিতাড়নের কাজ চলছে যা এখন তীব্র আকার ধারণ করেছে।

পাঠক, এই বিষয়টি দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হত না। যদি বাংলাদেশ না হত তাহলে আরাকানের মুসলমানরা কোথায় আশ্রয় নিত । ২০১২ ও ২০১৭ সালে আরাকানের মুসলিম নিধনের সময় লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম গণহত্যা হতে বাঁচার জন্য বাংলাদেশ নামক একটি মুসলিম রিয়াসাতে আশ্রয় নেয়। ভারত তো কোন রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয় নি।
যদি অখন্ড ভারত থাকত একটি রোহিঙ্গা ও গণহত্যা থেকে বাঁচতে পারত না।

পাঠক, একটি মুসলিম রিয়াসাত শুধু মাত্র নিজ দেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের গ্যারান্টার নয়, বরং তার আশেপাশের মুসলমানদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার গ্যারান্টার। পূর্ব ভারতের বা্লা ভাষাভাষী মুসলমানদের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার গ্যারান্টার হিসেবে বাংলাদেশের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ বাংলা ভাষা ভাষী কোন মুসলিম ভারতে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগ করলে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। বাংলাদেশ নামক মুসলিম রিয়াসাত বাংলা ভাষা ভাষী মুসলমানদের জন্য একটি আশীর্বাদ। বাংলা ভাষা ভাষী অনেক মুসলিম এদেশে আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন স্থানে চাকরি, ব্যাবসা ইত্যাদি সেক্টরে কাজ করছে। যদি বাংলাদেশ না হত, এই মুসলিমদের আশ্রয়ের কোন সহান ছিল না।

পাঠক, পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হত না, বাংলাদেশ না হলে পাশ্ববর্তী দেশের মুসলমানদের আশ্রয়ের কোন সহান ছিল না। কাজেই আরাকানের মুসলিম ও বাংলা ভাষা ভাষী মুসলমানদের আশ্রয়ের জন্য একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল যা পাকিস্তানের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ০৮
বিষয়:- পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মহা মুক্তির জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।
পাঠক, পাকিস্তান হল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য মুক্তির মহা সনদ । ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা। ১৭৫৭ সালে পলাশীর পতনের পর পূর্ব ভারত বিশেষ করে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অবস্থা খুবই করুণ ছিল।

১৭৫৭ সালে পূর্ব বাংলা হতে মুসলিম রিয়াসাতের পতন শুরু হয় এবং ১৯২৪ সালে উসমানীয় খিলাফতের পতনের মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ১৯২৪ সালে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা পরাধীন ছিল। মুসলমানদের এই পরাধীন যুগে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম অপেক্ষা অধিক সময় পরাধীন ছিল।

পূর্ব বাংলার মুসলমানরা শুধু মাত্র পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম এলাকা অপেক্ষা অধিক সময় পরাধীন ছিল ছিল না, বরং অধিক নিষ্পেষিত ছিল। কারণ পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার মুসলিমরা শুধু মাত্র অমুসলিমদের একক শাসনে ছিল, কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলমানরা দ্বৈত শাসনে ছিল। অথাৎ পূর্ব বাংলার মুসলমানরা ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের দ্বৈত শাসনের শিকার হয় ।অপরদিকে ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানরা আমাদের অপেক্ষা কম সময় পরাধীন ছিল এবং তারা দ্বৈত শাসনের অধীনে ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ উত্তর ভারত, দিল্লি, পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ ১৮৫৭ সালে পরাধীন হয় । আবার কিছু এলাকায় মুসলিম দেশীয় রাজ্য ছিল। ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের তূলনায় ভারতের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের পরাধীনতার স্থায়িত্ব ও নির্যাতিত হবার মাত্রা অনেক কম ছিল।

এমতাবস্থায় ভারতের যে কোন এলাকার মুসলমানদের তূলনায় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এমন নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার ছিল যে, সারা ভারতের মুসলমানরা অখন্ড ভারতের জন্য আন্দোলন করলেও পূর্ব বাংলার মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল।

খোদ কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যদি পাকিস্তানের দাবি পরিত্যাগ করতেন , তাহলেও পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানরা পাকিস্তানের দাবি পরিত্যাগ করত না। এর একটি জলন্ত উদাহরণ হল , কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন এ বি সি পরিকল্পনা মেনে নিয়েছিলেন তখন পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলিম নেতারা সিলেটের মাহমুদ আলীর মাধ্যমে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন এবং খোদ কায়েদে আজম যদি পাকিস্তানের দাবি পরিত্যাগ করে তাহলেও পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানরা পাকিস্তানের জন্য স্গ্রাম করে যাবে এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

কাজেই ভারতের অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের তূলনায় পূর্ব বাংলা ও আসামের মুসলমানদের মহা মুক্তির জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা বেশি ছিল।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ০৯

বিষয়ঃ- পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের একটি মুসলিম রিয়াসাতের জন্য অপরিহার্যতা।

পাঠক, ৭১১ সালে মুহাম্মদ বিন কাসিম পশ্চিম ভারতকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসে। ৭১১ সাল থেকে মোগল সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা পরাধীনতার তিক্ত স্বাদ ভোগ করে নি । অপরদিকে পূর্ব ভারত ১২০৪ সালে মুসলিম শাসনের অধীনে আসে এবং ১৪১৫ সালে কিছু দিনের জন্য

পরাধীনতার তিক্ত স্বাদ ভোগ করে।

পাঠক, পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা মোগল সাম্রাজ্যের পতন কালে কঠিন অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয়। শিখরা মুসলমানদেরকে গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যা ও শিখ রাজত্বের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহমেদ বেরলভী জিহাদ শুরু করেন এবং ১৮৩১ সালে বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেন।

১৮৫৭ সালে ভারত সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের পদানত হয় ফলে মুসলিম শক্তি সেখানে কোন ঠাসা হয়ে পড়ে। পশ্চিম ভারতে মুসলমানরা স্খ্যাগরিষ্ট ছিল ফলে সেখানে একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হতে থাকে। পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিল। তারা ইসলামকে নিয়ে বিভিন্ন কটুক্তি করত । লাহোরের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমানদেরকে সব সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় উস্কানি দিত । তারা ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময় কুৎসা রটনা করত । লাহোরের জনৈক হিন্দুত্ববাদী লেখক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে কুৎসা রটনা করলে একজন মুসলিম তরুণ তাকে হত্যা করে।

বস্তুত ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীদের সাথে মুসলমানদের সহ অবস্থান কোন মতেই সম্ভব ছিল না। পূর্ব ভারতের মুসলমানদের ন্যায় পশ্চিম ভারতের মুসলমানরা তাদের নিরাপত্তা ও অস্তিত্ব নিয়ে সংকটে নিপতিত হয়। হিন্দুত্ববাদী শক্তির মোকাবেলায় তারা ছিল অসহায়।

এমতাবস্থায় পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের নিরাপত্তা, অস্তিত্ব ও স্বার্থ রক্ষার্থে একটি মুসলিম রিয়াসাতের প্রয়োজনীয়তা ছিল যা পাকিস্তানের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।
তারিখ:- ০৭.০৮.২০২৫ ইং
চলমান

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ১০
বিষয়:- ইসলামী সভ্যতা রক্ষার জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।

পাঠক, প্রতিটি মুসলিম রিয়াসাতের জন্য ইসলামী সভ্যতা রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। ১৯২৪ সালে তুর্কি খিলাফত এর পতনের পর ইসলামী সভ্যতার পক্ষে বলার মতো কোন মুসলিম রিয়াসাত ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্য এশিয়ার বিশাল মুসলিম ভূখন্ড কমিউনিস্টদের পদানত হলে সেখানে ইসলামী

সভ্যতার বিপর্যয় ঘটে। আবার তুরস্ক ইসলামী সভ্যতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ পাশ্চাত্যের অনুকরণে চলা শুরু করে।

বস্তুত ১৯২৪ সালে উসমানী খিলাফত পতনের পর মুসলমানরা শুধু মাত্র রাজ্যহারা হয় নি , বরং পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা হতে ইসলামী সভ্যতা ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে যাচ্ছিল ।
বস্তুত খিলাফতের অবর্তমানে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যতিত ইসলামী সভ্যতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

ধর্মীয় অস্তিত্ব রাজনৈতিক অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক অস্তিত্বের উপর ধর্মীয় অস্তিত্ব নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ স্পেনে মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই, সেখানে ইসলামী সভ্যতার অস্তিত্ব নেই। আরাকানে মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব নেই, সেখানে ইসলামী সভ্যতার অস্তিত্ব নেই।

যা হোক, ইসলামী সভ্যতা রক্ষার জন্য একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল। মুসলমানদের এহেন ক্রান্তিকালে ইসলামী সভ্যতা রক্ষার জন্য একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল এজন্য পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য ছিল।

পাঠক, পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামী সভ্যতার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে কাজ করে আসছে।
১৯৯১ সালে বেইজিং সম্মেলনে যখন একটি ইনিফাইড সিভিল কোডের প্রস্তাব এসেছিল , তখন একমাত্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো এর বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা পালন কর

কাজেই ইসলামী সভ্যতা রক্ষার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল। এখনো পাকিস্তান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে ইসলামী সভ্যতার পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়ে থাকে।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ১১

বিষয়:- মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।

পাঠক, জ্ঞান বিজ্ঞান হল মুসলমানদের হারানো সম্পদ । এই ক্ষেত্রে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে অমুসলিম শক্তি মুসলমানদের উপর আগ্রাসন চালিয়ে মুসলিম রিয়াসাত গুলোকে পদানত করে।

জ্ঞান বিজ্ঞানের দুইটি দিক রয়েছে, একটি পার্থিব দিক অপরটি হল ধর্মীয় দিক। ধর্মীয় ইলমের জন্য রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা আবশ্যক না হলেও পার্থিব ইলমের প্রসারতার জন্য রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা আবশ্যক। ধর্মীয় ইলম চর্চায় রাষ্ট্র সহযোগিতা করলে সেই ইলম রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ব্যাবহারের সুযোগ তৈরি হয় ।

মুসলমানদের পতনকালে উভয় প্রকার ইলমে মুসলমানদের বিকাশ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।
এমতাবস্থায় উভয় প্রকার ইলমের সহযোগিতার জন্য মুসলমানদের একটি রিয়াসাত আবশ্যক ছিল।
পাকিস্তান সেই আবশ্যকতা কিছুটা হলেও পূরন করেছে।

উভয়বিধ ইলমের জন্য পাকিস্তান হল মুসলিম বিশ্বের অগ্রপথিক। পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের প্রথম দেশ যা পারমাণবিক শক্তি অর্জন করে।

বস্তুত ১৬৯৭ সালে উসমানীয় বাহিনী মালাজর্কাদের যুদ্ধে পরাস্ত হইলে মুসলমানদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব হয় এবং এই যুদ্ধের পর হতে মুসলমানরা সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব তেমনভাবে প্রদর্শন করতে পারিনি ।
এদিকে ইউরোপে রেঁনেসা এবং শিল্প বিপ্লব শুরু হলে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা ও আবিষ্কার শুরু হয়। এই সময় মুসলিম দেশগুলোতে ইলমের তেমন চর্চা না থাকায় মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে এবং একের পর এক মুসলিম এলাকা ইউরোপীয়দের পদানত হতে থাকে।

১৬৯৭ সালে মুসলিম ভূখণ্ডের পশ্চিম সীমান্তে মালাজকার্দ যুদ্ধে ওসমানীয় বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর মুসলমানদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব হয় ।
এর আরও ৬০ বছর পর ১৭৫৭ সালে মুসলিম বিশ্বের পূর্বপ্রান্তে ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে মুসলিম বিশ্বের পরাজয়ের সূত্রপাত ঘটে ।
এইসব পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল মুসলিম বিশ্বের সামরিক গবেষণা ছিল না। আবার পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল সামরিক গবেষণা করতে গিয়ে উসমানীয় খেলাফত ইব্রাহিম আল মোতাবারিকার মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি আমদানি করে যার ফলে উসমানীয় খেলাফত আভ্যন্তরীণ ভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই দুর্বলতার ফলে ১৯২৪ সালে খিলাফতের পতন ঘটে।

অতঃপর ১৯২৪ সালে উসমানী খিলাফত পতনের পর মুসলমানদের জন্য একটি রিয়াসতের আবশ্যক হয়ে করে যে রিয়াসত মুসলমানদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় অগ্রনায়ক হবে এবং নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখবে । এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তান নামক একটি মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্বের অপরিহার্য ছিল ।

বিজ্ঞানী আব্দুল কাদির খান বিগত কয়েকশত বছরের মধ্যে প্রথম মুসলিম বিজ্ঞানী যিনি মুসলমান শক্তিকে সামরিক দিক দিয়ে থেকে রাখার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন করেন । এই কারনে পাকিস্তান হল সমস্ত

পৃথিবীর মধ্যে সামরিক দিক দিয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ।

আবার উসমানী পরিবারের মুফতি শফি ওসমানী, আল্লামা তকী উসমানী , আল্লামা রফি ওসমানী গন শরীয়া শাস্ত্রাদিতে ব্যাপক অবদান রাখেন যা সমস্ত পৃথিবীর মুসলমানদের জন্য একটি অনুসরনীয় । ধর্মীয় ও পার্থিব ইলমের ক্ষেত্রে পাকিস্তান হল মুসলমানদের অগ্রদূত। এই সব দিক বিবেচনা করে মুসলমানদের জন্য একটি মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল যা পাকিস্তানের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ১২
বিষয়ঃ- কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক দেশের জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।

পাঠক, উসমানীয় খেলাফতের পতনের পর পৃথিবীতে শরিয়া ভিত্তিক কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না এবং যে সব রাষ্ট্র ছিল তা ছিল আছাবিয়্যাত ভিত্তিক রাষ্ট্র যার কোন শরয়ী বৈধতা ছিল না।

১৯২৪ সালের পর পৃথিবীর মুসলমানরা যেহেতু রাজ্যহীন , রাষ্ট্রহীন রাখালহীন এবং অমাবস্যার রজনীতে

মহাসাগরের সমুদ্রে নিমজ্জিত এক তরীর মত ভাসছিল, সেই সময়ই মুসলমানদের জন্য এমন একটি রাষ্ট্রের আবশ্যক ছিল যেখানে মুসলমানরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা সহ শরয়ী আইন বাস্তবায়ন করবে ।

পাঠক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন কমিউনিজম এর উত্থান ঘটে তখন পৃথিবীর রাষ্ট্র সমূহ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই উভয় প্রকার মতবাদ শরীয়তে অনুমোদন নেই। অথচ পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ ইসলামের অনুসারী ছিল।

এই উভয় মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে মুসলমানদের জন্য এমন একটি রাষ্ট্রের আবশ্যক ছিল যে রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হবে। এই দৃষ্টিতে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের আবশ্যক ছিল।

পাঠক, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫১ সালে আল্লামা সুলাইমান নদভীর সভাপতিত্বে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ইসলাম ধর্মের সমস্ত মত এবং পথের উলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন । সেখানে শিয়া -সুন্নির কোন ভেদাভেদ ছিল না সুন্নিদের বিভিন্ন পথ এবং মাসলাক এবং শিয়াদের বিভিন্ন পথ এবং মাসলাক সবাই উপস্থিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি সমন্বিত রূপরেখা প্রদান করেন ।

পাঠক, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদাতের পর এই প্রথম ১৯৫১ সালে উলামায়ে ইসলাম একত্রিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের রুপরেখা সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেন । অতঃপর এর সূত্র ধরে ১৯৫৬ সালে ইসলামী সংবিধান প্রবর্তিত হয় । এবং জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানে শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আত্মনিবেদিত প্রাণ ছিলেন ।এদিকে পাকিস্তানের অপর অংশ বাংলাদেশে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং জেনারেল এরশাদ তাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠতা থাকাকালীন সময়ে ইসলামী সভ্যতার বিকাশ ঘটে।

পাঠক, একটি মুসলিম রিয়াসাতের দাবি হল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেশকে পরিচালনা করা। এই হিসেবে মুসলমানদের একটি রিয়াসাত এর দরকার ছিল।উসমানী খেলাফতের পতনের পর কুরআন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের অপরিহার্য ছিল।

পাকিস্তানের আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা, পর্ব ১৩
বিষয়ঃ- ভারতীয় মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানের অপরিহার্যতা।

পাঠক, ব্রিটিশ আমলে ভারতের মুসলমানরা জন স্খ্যার বিবেচনায় মাইনোরিটি ছিল , কিন্তু অঞ্চল ভেদে কোন কোন স্থানে মেজরিটি ছিল । এই মুসলিম মেজরিটি অঞ্চল সমূহকে নিয়ে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে একবার একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছিল ।যদি এক বা একাধিক শক্তিশালী মুসলিম রিয়াসাতের অস্তিত্ব

থাকে, তাহলে ভারত এই মুসলিম রিয়াসাতের জন্য ভারতে থাকা মুসলমানদের উপর নির্যাতন করার সাহস করবে না।

পাঠক, ১৯৭১ সালের পূর্বে ভারতের মুসলমানদের উপর নির্যাতনের মাত্রা অনেক কম ছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান দ্বি খন্ডিত হবার পর ভারতীয় মুসলমানদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায়। আবার পূর্ব ভারতের মুসলিম রিয়াসত বাংলাদেশে যখন ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিস্তৃতি এবং গভীর হয়েছিল , তখন কাশ্মীরের মুসলমানদের স্বায়ত্তশাসন শাসনের অধিকার কেড়ে নেয়।

পাঠক , প্রাকৃতিক এবং ঐতিহাসিকগত ভাবেই সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব ওই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা গুরদের অস্তিত্ব এবং শক্তিমত্তার ওপর নির্ভর করে । এমনই ভাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহকে নিয়ে যদি এক বা একাধিক রাষ্ট্র তৈরি হয় তাহলে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা অন্যান্য মুসলমানদের উপর অত্যাচারের মাত্রাটা হ্রাস পাবে ।

পাঠক হিন্দুত্ববাদী শক্তির অত্যাচার হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকেই ভারতীয় মুসলমানরা ভারত থেকে হিজরত করে পাকিস্তানি আশ্রয় গ্রহণ করে । উদাহরণ স্বরূপ ১৯৪৮ সালে যখন হায়দ্রাবাদ নামক মুসলিম রিয়াসতটি ভারত দখল করে, তখন অনেক হায়দ্রাবাদি মুসলমানগণ পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল । আবার মুসলিম রিয়াসত জুনাগর রাজ্য যখন ভারতের পদানত হয় , তখন অনেক মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল । এমন অবস্থায় ভারতের সংখ্যালঘু মজলুম মুসলমানদের আশ্রয়ের জন্য একটি রাষ্ট্র আবশ্যক ছিল ।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতাঃ- পর্ব ০১
বিষয়ঃ- ভূমিকা।

পাঠক, ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব হল এই ভূখণ্ডে মুসলমানদের পাঁচটি বড় অর্জনের একটি। এই ভূখণ্ডের মুসলমানদের পাঁচটি বড় অর্জন হল,

প্রথমত:- ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক এই ভূখণ্ডকে ইসলামের পতাকাতলে আনয়ন করা।

দ্বিতীয়ত :- ১৪১৫ সালে হিন্দু রাজা গনেশ মুসলিম শাসন উৎখাত করে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলে পর দরবেশ নূর কুতুব আলমের আহবানে জৈনপুরের সূলতান ইব্রাহিম শারকীর বাংলায় আগমন এবং মুসলিম রিয়াসাতের পূন:প্রতিষ্টা ।

তৃতীয়ত- ১৯০৫ সালে মুসলিম জাতিসত্তার ভিত্তিতে ব্গভ্গ।

চতুর্থত- ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান অর্জন।

পঞ্চমত - ২০২৪ সালে জুলাই বিপ্লব ।

পাঠক, এই পাঁচটি ঘটনা ব্যতিত আরো দুটি ঘটনা বাংলাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একটি হল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এবং ১৯৭৫ সালের ৭ ই নভেম্বর। আফসোসের বিষয় হল ১৫ ই আগষ্ট ও ৭ ই নভেম্বর এর সুবিধাভোগীরা উপরোক্ত পাঁচটি ঘটনাকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করতে চায়। অবশ্য হাতে গোনা দুই একজন মুসলমান এখনো জীবিত আছে যারা পারিবারিক ভাবে মুসলিম জাতিসত্তার চেতনা ধারণ করেন এবং জুলাই বিপ্লবে উনাদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগষ্ট ও ৭ ই নভেম্বর এর মূল সুবিধা ভোগী এবং উনাদের অনুসারীরা মুসলিম জাতিসত্তাকে অস্বীকার করে উল্টো পথে হাঁটতেছেন। এই ভূল পথে হাঁটার কারণে মুসলমানদেরকে আবার ও মারাত্মক খেসারত দিতে হবে। ১৫ ই আগষ্ট বিপ্লবের সুবিধা ভোগীরা যদি মুসলিম জাতিসত্তা ও ইসলামী সভ্যতাকে অস্বীকার করে ভূল পথে হাঁটতে থাকে তাহলে এদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য মুসলমানদেরকে আরেকটি বিপ্লবের পথে হাঁটতে হবে।

হাসিনার শাসনকে শুধু মাত্র দু:শাষন বললে ভূল হবে, এটি হল মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বনিকৃষ্ট শাষনের একটি। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু অত্যাচারী শাষক ছিল, কিন্তু এই অত্যাচারী শাসকগন সবাই স্ব-জাতির অস্তিত্বের জন্য অথবা নিজের ক্ষমতার জন্য অত্যাচার নির্যাতন করেছে। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে আপনি এমন একজন শাষক খুঁজে পাবেন না, যারা নিজ জাতি ও স্বধর্মীয় লোকদেরকে অন্য জাতির গোলামে পরিনত করার জন্য চেষ্টা করেছে অথবা গোলামে পরিনত করার চিন্তা করেছে ।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে অনেক বেঈমান এসেছে যারা মুসলমানদেরকে গোলামে পরিনত করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এসব বেঈমানদের মধ্যে হাসিনা অন্যতম যার নাম মীর জাফরের সাথে উচ্চারন করা যেতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে জাতীর গাদ্দার হিসেবে মীর জাফরের সাথে হাসিনার নাম উচ্চারিত হবে।

উলামায়ে কেরামগনের মতে, ঈমান ভেগর অন্যতম কারণ হলো মুসলমানদের অস্তিত্ব, অধিকার ও স্বার্থকে অমুসলিমদের নিকট সমর্পণ করা।

যা হোক, হিন্দুত্ববাদী শাষনের অবসান, মুসলমানদের আজাদী, মুসলমানদের অস্তিত্ব, মুসলমানদের স্বার্থ ও মুসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী শাষন হতে মুক্তি পেয়ে একটি স্বাধীন মুসলিম রিয়াসাত প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। আমি জুলাই বিপ্লবের আবশ্যকতা সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে পর্ব আকারে বিস্তারিত আলোচনা করব , ইনশাল্লাহ।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা:- পর্ব ০২
বিষয়:- হিন্দুত্ববাদী শাষন ব্যাবস্থার অবসান।

পাঠক, হিন্দুত্ববাদী শাষন ব্যাবস্থা বলতে বুঝায় মুসলমানদের উপর হিন্দুদের আধিপত্য। হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমানদেরকে তাদের গোলামে পরিনত করতে চাই । ভারতে মুসলিম শাষন আগমনের পর হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমানদেরকে সমূলে উৎপাটন করার জন্য সদা সর্বদা সচেষ্ট। সুযোগ পেলেই তারা মুসলমানদের উপর

অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে সহ অবস্থানে বিশ্বাসী। মুসলমান শাসকরা ইচ্ছে করলে ভারত থেকে হিন্দুদের বিলুপ্ত করে দিতে পারত। হিন্দুত্ববাদীরা ভারতের বৌদ্ধদের গণহত্যা চালিয়েছে, তাদেরকে ভারত হতে বিতাড়িত করেছে। এক সময়ের স্খ্যাগরিষ্ট বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দুত্ববাদীদের বদৌলতে এখন প্রায় শূন্য।

হিন্দুত্ববাদ ও হিন্দু এক বিষয় নয়। সাধারণ হিন্দুরা মুসলমানদের সাথে সহ অবস্থানে বিশ্বাসী পক্ষান্তরে হিন্দুবাদীরা মুসলমানদেরকে এই দেশ হতে উৎখাত করতে ও মুসলমানদেরকে তাদের গোলামে পরিনত করতে বদ্ধপরিকর। একজন নামধারী মুসলিম হিন্দুবাদের ধারক বাহক হতে পারে, এর একটি উদাহরণ হল শেখ হাসিনা। আবার একজন হিন্দু মুসলমানের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে, এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল যোগেন মন্ডল।

পাঠক, ভারতীয় মুসলমানদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের প্রথম থাবা রাজা গনেশ দিয়েছিল।
মধ্যযুগে ১৪১৫ সালে রাজা গনেশ মুসলিম শাসনকে উৎখাত করে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে । রাজা গনেশ বাংলার ইলিয়াস শাহী সুলতানকে উৎখাত করে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে । রাজা গনেশ অগনিত মুসলমানদেরকে হত্যা করে এবং অসংখ্য আলেম ওলামাদের হত্যা করে, এমনকি দরবেশ নূর কুতুব আলমের পুত্রকে সোনার গায়ে হত্যা করে। অবশেষে দরবেশ নূর কুতুব আলমের আহবানে জৈনপুরের সূলতান ইব্রাহিম শারকী বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে মুসলমানদেরকে হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচার হতে উদ্বার করেন ।

যা হোক, ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পটভূমি ঠিক মধ্যযুগের রাজা গনেশের ইতিহাসের সাথে মিল রয়েছে। রাজা গনেশের মাধ্যমে একটি মুসলিম রিয়াসাত যেভাবে হিন্দু রাজত্বে পরিনত হয়েছিল ঠিক তেমনি হাসিনা মুসলিম রিয়াসতকে পৌত্তলিকদের গোলামে পরিনত করেছিল।

রাজা গনেশের ক্ষমতায় আরোহণ এবং হাসিনার মসনদে আরোহন এক সূত্রে গ্রথিত আর তা হল পৌত্তলিকদের উত্থান এবং তাদের রাজত্বে মুসলমানদের করুন পরিনতি এবং দূর্বিসহ জীবন এবং মুসলমানদের গোলামে পরিনত করার ইতিহাস ।

রাজা গনেশ এর রাজত্বের সাথে হাসিনার রাজত্বের অনেকটা মিল রয়েছে। রাজা গনেশ যেমন নুর কতুব আলম এর পুত্র সহ অনেক আলেম ওলামা ও মুসলমানদের হত্যা করেছিল, ঠিক তেমনি হাসিনা মতিউর রহমান নিজামী সহ অনেক আলেম ওলামা ও মুসলমানদের হত্যা করে।

রাজা গনেশ ও আওয়ামী লীগের শাসনের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। হাসিনার শাসন ছিল রাজা গনেশের শাসন অপেক্ষা অধিকতর নিকৃষ্ট । রাজা গনেশের প্রেতাত্মা আওয়ামী লীগ মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন জঘন্য কাজ করেছে যা ভারতবর্ষের কোন মুসলিম শাসক কেন হিন্দু শাসকরাও করে নি

হাসিনার আমল ছিল হিন্দুত্ববাদীদের রাজত্ব। এই সময়ে মুসলমানরা ছিল নিজ দেশে পরবাসী। অনেক মুসলমান এই হিন্দুত্ববাদী শাষনের আমলে দেশের বাইরে হিজরত করে। এই হিন্দুত্ববাদী শাষনের অবসানের জন্য জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য। জুলাই বিপ্লব না হলে মুসলমানদের পরিনতি ছিল হিন্দুদের

গোলামে পরিনত হওয়া। তাই জুলাই বিপ্লব ছিল এদেশের মুসলমানদের হিন্দুত্ববাদী শক্তির গোলামী হতে বাঁচার জন্য একটি অপরিহার্য বিপ্লব।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা:- পর্ব ০৩
বিষয়:- মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক, ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক ছিল।
এখন আসা যাক, মুসলমানদের অস্তিত্ব বলতে কি বুঝায়? মুসলমানদের অস্তিত্ব বলতে তাওহীদ ও নবুয়ত - রিসালতে বিশ্বাসী ব্যাক্তি বা জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং তাদের ধর্ম - কর্ম করার স্বাধীনতা । ভারতীয়

মুসলমান বিশেষ করে পূর্ব ভারতের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য হিন্দুত্ববাদীরা মারাত্মক হুমকি। হিন্দুত্ববাদীরা মুসলমানদেরকে গণহত্যা চালিয়ে সমূলে বিনাশ করতে চায়।

পাঠক, ১৭০৭ সালে মোগল সম্রাট আলমগীর ইন্তেকাল করার পর মোগল সাম্রাজ্যের দূর্বলতার সুযোগে ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের উত্থান ঘটে । এই হিন্দুত্ববাদীর ধারক বাহক মারাঠারা পূর্ব ভারতের মুসলমানদেরকে গণহত্যা, লুণ্ঠন চালায় , এমনকি এই হিন্দুত্ববাদীদের কবল থেকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পিতা জয়নুদ্দিন মোহাম্মদ ও রেহাই পায়নি।

এই হিন্দুত্ববাদীরা ১৯৪৬ সালে বিহারে দা্গা লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ উর্দূভাষী মুসলমানদেরকে গণহত্যা চালায়। ১৯৪৮ সালে হায়দরাবাদ দখল করে হিন্দুত্ববাদী শক্তি লাখ লাখ মুসলমানদের হত্যা করে। ১৯৭১ সালে এই হিন্দুত্ববাদী শক্তি বা্লাদেশে লক্ষ লক্ষ উর্দু ভাষী মুহাজির মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে। এই হিন্দুত্ববাদী শক্তি মুসলমানদের উপর গণহত্যা চালানোর জন্য সদা প্রস্তুত। হিন্দুত্ববাদী শক্তি সব সময় মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। এরা সুযোগ পেলেই মুসলমানদের অস্তিত্ব শেষ করে দিতে চায়।

পাঠক, আওয়ামী লীগ হল হিন্দুত্ববাদের ধারক বাহক। এই বিষয়টি হাসিনার আমলে মুসলমানরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে। কারণ ২০০৯ সালে হিন্দুত্ববাদীরা পীলখানায় গণহত্যা চালায়, ২০১৩ সালে শাপলায় গণহত্যা চালানো হয়। হাসিনা হিন্দুত্ববাদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য এহেন জঘন্য কাজ নেই যা করেনি ।

হাসিনার আমলে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে কথা বললেই জুলুমের শিকার হতে হয়েছিল। হিন্দুত্ববাদের ধারক বাহক হাসিনার শাসনামলে এদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত হয়েছিল।

হাসিনার শাসন আমল পুরোটাই ছিল মুসলিম নিধনের মহোৎসব। যেখানে মুসলমানরা অনেক সময় বিবেকের তাড়নায় মজলুম মুসলমানদের হত্যা করতে ইতস্তত করত, সেখানে হিন্দুদের দ্বারা মজলুম মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ওসি প্রদীপ বহু মুসলমানকে হত্যা করেছে।

কাজেই মুসলমানদেরকে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য এবং মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা:- পর্ব ০৪
বিষয়:- মুসলমানদের অধিকারের জন্য জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক, মুসলমানদের অধিকার বলতে বুঝায় অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় মুসলমানদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার যা আইন দ্বারা সৃষ্ট এবং স্বীকৃত। একজন মুসলমানের বিভিন্ন ধরনের অধিকার থাকে, যেমন চাকরি পাবার অধিকার, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার আওয়াজ বুলন্দ করার অধিকার, নিজ ধর্মের

প্রয়োজনীয় বিধান শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি।

আমি পূর্ববর্তী পর্বে আলোচনা করেছি যে, হাসিনা ছিল হিন্দুত্ববাদীদের সহযোগী শক্তি যার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুত্ববাদীদের প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য মুসলমানদের অধিকারকে ছিনতাই করে এই হাসিনা সরকার হিন্দুত্ববাদীদেরকে প্রমোট করেছিল।

একটি মুসলিম রিয়াসাত অবশ্যই অমুসলিমদের নায্য অধিকার বাস্তবায়নে গ্যারান্টার। কিন্তু হাসিনা ছিল মুসলিম অধিকার ছিনতাই করে হিন্দুত্ববাদীদের ক্ষমতায় আরোহণ করার গ্যারান্টার।

২০০৯ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যদি আপনি সরকারী চাকুরীর খতিয়ান দেখেন, তাহলে লক্ষ্য করবেন যে, মুসলিম কর্মচারী ও কর্মকর্তারা ছিল কোন ঠাসা । মুসলিম জাতিসত্তার চেতনায় বিশ্বাসী অনেক অফিসারদের বরখাস্ত করা হয়েছে। মুসলিম জাতিসত্তার বিশ্বাসী লোকদের চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া ছিল অঘোষিত ভাবে নিষিদ্ধ।

সব জায়গায় হিন্দুত্ববাদীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, হিন্দু না পেলে মুসলিম নামধারী হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। হিন্দুত্ববাদী হাসিনার শাসনামলে মুসলমানদের জন্য কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না।

একটি মুসলিম রিয়াসাত মুসলমানদের করের টাকায় পরিচালিত হয়, আর মুসলমানদের করের টাকায় হাসিনা হিন্দুত্ববাদীদের হয়ে কাজ করছে। মুসলমানদের অধিকার ভূলুণ্ঠিত করেছে।

পাঠক, মুসলমানদের অধিকার রক্ষার জন্য জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতাঃ- পর্ব ০৫
বিষয়ঃ- মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক, মুসলমানদের স্বার্থ বলতে মুসলমানদের ব্যাক্তিগত, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় আর্থিক স্বার্থকে বুঝায় । আওয়ামী লীগ তার জন্ম লগ্ন থেকেই মুসলমানদের স্বার্থকে হিন্দুত্ববাদীদের পদতলে সমর্পণ করে।

১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের সম্মতিক্রমে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ হতে লক্ষ কোটি টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। মেজর জলিল বাধা দিলে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসলে আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় ভারতীয় ব্যাবসায়ী শেয়ার মার্কেট লুটপাট করেছে । ভারতীয় শেয়ার ব্যাবসায়ী শেয়ার বাজার হতে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট নিয়ে যায়। হাসিনার আমলে এদেশ ছিল ভারতের অর্থনৈতিক কলোনী ।

২০০৯ এ ক্ষমতায় আসার পর ভারতীয় ব্যাবসায়ীদের ফাকা চেক দিয়ে আসে । একটি মুসলিম রিয়াসাতে মুসলমানদেরকে চাকরি না দিয়ে হিন্দুদের চাকরিতে নিয়োগ দেয় । আবার মুসলিম অপেক্ষা হিন্দুদের বেতন কয়েক গুণ বেশি।

পাঠক, আওয়ামী লীগ সব সময় চাচ্ছিল যে বাংলাদেশ যাতে আর্থিকভাবে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে । কারণ ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে ভারত সব সময় তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী এদেশের হিন্দুত্ববাদী শক্তি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখবে ।

তাই তারা সবসময় ভারতকে এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদেরকে বাংলাদেশের মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক সুবিধা প্রদান করত । শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর অর্থনৈতিক যে কোন চুক্তি ভারতের সাথে অগ্রগন্যতার ভিত্তিতে করত , এই সব চুক্তিগুলো ছিল দেশের স্বার্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আওয়ামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের গোলাম আব্দুল মোমিন বলেছিল যে, ভারত বাংলাদেশের সম্পর্ক হল স্বামী স্ত্রীর অনুরূপ। হাসিনা বলেছিল যে, ভারতকে যা দিয়েছি তা ভারত কখনো ভূলতে পারবে না। এই সব কথা বার্তা প্রমাণ করে এদেশের স্বার্থ ভারতের পদতলে জলাঞ্জলি দিয়েছে। এদেশের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতাঃ- পর্ব ০৬
বিষয়ঃ- ইসলামের অবমাননা রোধকল্পে জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক, আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আওয়ামী লীগ হল হিন্দুত্ববাদের ধারক বাহক। হিন্দুত্ববাদ আর হিন্দু এক নয় । হিন্দুত্ববাদ হল মুসলমানদের চিরতরে বিনাশ করতে হিন্দুদের একটি অংশের মনোভাব। এই অংশটি এখন ভারতের ক্ষমতাসীন। অবশ্য ১৯৪৭ সালের পর থেকে ভারতীয় সব সরকার কমবেশি হিন্দুত্ববাদী ছিল। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময় কেগ্রস ক্ষমতায় থাকলেও তারা হিন্দুত্ববাদীদের সহযোগী শক্তি ছিল।

২০০৯ সালে বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী শক্তি ক্ষমতায় আসার পর ইসলাম অবমাননার কাজ শুরু হয় ।২০১৩ সালে এর চরম আকার ধারণ করে। ২০১৩ সালে শাহবাগকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী শক্তির ধর্ম অবমাননার বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় । ২০১৩ সালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে হিন্দুত্ববাদী শক্তি যে ধরনের কটুক্তি করেছে তা বলার ভাষা নেই।

এই হিন্দুত্ববাদী শক্তি অনলাইনে বিভিন্ন ব্লগ খোলে ইসলামকে অবমাননা শুরু করে। এছাড়া এই হিন্দুত্ববাদী শক্তির এজেন্ট বিভিন্ন গনমাধ্যম ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের মদদ দাতা ছিল। এই হিন্দুত্ববাদী গনমাধ্যমে গুলো বিভিন্ন সময়ে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করে।

২০০৭ সালে কেয়ার টেকার সরকার এর সময় একটি হিন্দুত্ববাদী গনমাধ্যম ইসলামের অবমাননা করলে মাফ চেয়ে পার পায় । কিন্তু হিন্দুত্ববাদী শক্তি হাসিনার আমলে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় নেতাদের চরিত্র হননে কোন কমতি করে নি ।

আওয়ামী লীগ সব সময় এদেশের মুসলমানদের ধোঁকা দিয়েছে। তাদের রাজনৈতিক গ্রুপটি সাধু সেজে অন্যদের ইসলাম ধর্মের অবমাননার সুযোগ দেয় ।
তারিখ --১৮.০৭.২০২৫ ইং

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা:- পর্ব ০৭
বিষয়:-মানবাধিকার রক্ষায় জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক, হাসিনার আমলে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় যা ১৯৭৫ সালের পর এত চরম আকার ধারণ করে নি । ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান এর আমলে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয় । এই সময় হাজার হাজার আওয়ামী লীগ বিরোধীদের হত্যা করা হয়। হাসিনা ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর আবার ১৯৭২ সালের দুঃশাসন চলে আসে এবং জনগণের উপর নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন।

জুলাই বিপ্লব মানবাধিকার রক্ষার জন্য আবশ্যক ছিল। হাসিনা এমন কোন জঘন্য কাজ নেই যা সে করে নি । দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হলে শারীরিক নির্যাতন করা যাবে না। অথচ আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী কে হাসিনা সরকার জিজ্ঞাসা বাদের নামে মারাত্মক ভাবে পিটিয়েছে।

এই সেই আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী যিনি জীবনে কোন মিথ্যা কথা বলছেন মর্মে কেহ বলতে পারবে না। অথচ সত্য কথা স্বীকারের নামে উনাকে যেভাবে পিটিয়েছে তা ইতিহাসের একটি জঘন্যতম অপরাধ।

পাঠক , আওয়ামী লীগ কখনো মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিনি বরং সব সময় মানবাধিকারের প্রতি বৃদ্বাংগুলি দেখিয়ে দেশ শাসন করেছে । এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের আস্কারা দাতা হল ভারত । বাংলার মুসলমানরা যেদিন বুঝবে যে ভারত তাদের একমাত্র এবং মূল শত্রু তখন এ বাংলার মুসলমানরা স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করবে।

এদিকে হাসিনার আমলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতা কর্মীদের প্রতি নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন। লক্ষ লক্ষ নিরীহ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিনা বিচারে হত্যা, গুম , নির্যাতন করে । বি এন পি এর মধ্যে যারা হিন্দুত্ববাদ বিরোধী তাদের উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। বি এন পি ও জামাতে ইসলামীর বাইরে যারা হিন্দুত্ববাদ বিরোধী দল ও লোক রয়েছে তারাও ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছে। মোদ্দা কথা, এই হিন্দুত্ববাদী শক্তির শাসনামলে মানবতা , মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

যদি কোন সরকার বা কোন দল ভারতকে নিজেদের বন্ধু দেশ হিসাবে মনে করে তাহলে সেই দল এবং ব্যক্তি অথবা গুষ্টিকে বর্জন করা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক নতুবা মুসলমানরা তাদের জীবন দিয়ে এর খেসারত দিবে ।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা:- পর্ব ০৮
বিষয়:-দূর্নীতি রোধকল্পে জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক, একটি মুসলিম রিয়াসাতকে পরাধীন হওয়ার জন্য দূর্নীতি হল অন্যতম কারণ। শুধু একটি মুসলিম রিয়াসাত নয় , বরং দূর্নীতি হল মানব সভ্যতার অন্যতম অভিশাপ। দূর্নীতি মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা চেতনা উম্মেষ তথা বিকশিত হবার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা, কারণ দূর্নীতিতে নিমজ্জিত হলে কোন ইলম বা নতুনত্ব বিকশিত হবার সম্ভাবনা নেই। মানুষ যদি কোন কিছু দূর্নীতির মাধ্যমে অর্জন করতে পারে, তাহলে এর জন্য জনগন কখনো চিন্তা শক্তি ব্যয় করবে না। প্রতিটি উদ্ভাবন বা নতুনত্বের পিছনে রয়েছে চিন্তা শক্তি। যদি দূর্নীতির কারনে চিন্তা শক্তি রোধ হয়ে যায়, তাহলে উদ্ভাবন বা নতুনত্ব আসার কোন সম্ভাবনা নেই।

দূর্নীতির আরো কু প্রভাব রয়েছে। যেমন দূর্নীতির মাধ্যমে ন্যায় বিচারকে প্রভাবিত করে, মানুষের হক নষ্ট হয়ে থাকে।

পাঠক, আওয়ামী লীগ আপাদমস্তক একটি দূর্নীতি বাজ দল। এই দলটি হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্টার নিমিত্তে আত্ম নিবেদিত যে দল সব সময় দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ দুর্নীতির এমন উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায় যা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইতিপূর্বে নজির নেই ।

১৯৭২ সালে রেড ক্রিসেন্ট করতে সাড়ে ৭ কোটি কম্বল তারা গায়েব করে ফেলেছে এবং গাজী গোলাম মোস্তফা নামক এক দুর্নীতিবাজ লোক এই সমস্ত টাকা ভারতে পাচার করেছিল । আওয়ামী লীগ সব সময় বাংলাদেশে এসে তারা দুর্নীতি টাকা ভারতে পাচার করে এবং এসব দুর্নীতির টাকা দিয়ে তারা ভারতের সাথে দক্ষতা না ২০০৯ সালে হাসিনা ক্ষমতায় এসে দুর্নীতিতে যারা ভালো এবং দক্ষ তাদেরকে তার সহযোগিতা হিসেবে মনোনয়ন দান করে, কারণ দুর্নীতিবাজ লোকগুলি কোন অপরাধের প্রতিবাদ করতে সাহস পাই না এবং দুর্নীতিবাজ লোকগুলি গোলামের পিঞ্জিরা আবদ্ধ হতে ভালোবাসে । এই ২০০৯ সালে হাসিনার এদেশে ক্ষমতায় আসার পেছনে কারণ ছিল যে বাংলাদেশকে তারা অর্থাৎ ভারতের হিন্দুত্ববাদে শক্তি দখল করে ফেলবে এজন্য দুর্নীতিতে বারবার বারবার তারা সহায়তা করেছে ।

এই হাসিনার আমলে সরকারি অফিসে দূর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হত , এমনকি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ও দূর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হত । অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা দূর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে ।হাসিনার অফিসের একজন পিয়ন ও শতকোটি টাকার মালিক ছিল। দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি দেয়া হত । এমনকি নিজ দলের লোকজনকে দূর্নীতির সুযোগ করে দিত । এই আমলটি বাংলাদেশের সর্বকালের সবচেয়ে বেশি দূর্নীতি হয়েছে। নিজেরা দূর্নীতি করেছে অথচ একজন সৎ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে সাজানো দূর্নীতির মামলায় জেলে পুরানো হয়েছিল। এই দূর্নীতিবাজদের উৎখাত করতে জুলাই বিপ্লব আবশ্যক ছিল।
হাসিনার শাসন আমলটি ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ দূর্নীতিবাজ শাসন ব্যবস্থার একটি । প্রধানমন্ত্রীর অফিসের একজন পিয়ন যদি শত কোটি টাকার মালিক হয় , তাহলে বুঝেন দূর্নীতি কোন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল । সারা দেশ দূর্নীতির কবলে নিপতিত হয়েছিল। তাই একটি মুসলিম রিয়াসাতকে দূর্নীতির করাল গ্রাস হতে বাঁচানোর জন্য জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য।
আল্লাহ জুলাই বিপ্লবের শহীদদের জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতাঃ- পর্ব ০৯
বিষয়ঃ- শিক্ষা ব্যবস্থার বরবাদ রোধকল্পে জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক , আওয়ামী লীগ কখনোই এদেশের মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল না । তারা সব সময় মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায় আঘাত করার জন্য চেষ্টা করে থাকে। ১৯৫৬ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রাদেশিক সরকার থাকাকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ কর্তৃক মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী খান আতাউর রহমান খান প্রশাসনিক আদেশ মূলে বাংলাদেশের নিউ স্কিম মাদ্রাসা গুলিকে স্কুলে রূপান্তর করা ফেলেছিল ।

পাঠক, মুসলমানরা সম্পত্তি মাদরাসায় দান করেছিল সেখানে কুরআন এবং সুন্নাহ অধ্যায় হবে এবং

পরকালীন মুক্তি লাভ করিবে কিন্তু আওয়ামী লীগ মুসলমানদের এই অভিব্যক্তি উপেক্ষা করে তারা স্কুল কলেজ বানিয়ে সেখানে মুসলমানদের অধিকার কে ক্ষুন্ন করে।

পাঠক , যখনই আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসে তখন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা হোঁচট খায় । ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা স্কুল কলেজ থেকে সংকুচিত করে ফেলা হয় , সেখানে নৈতিকতার নামে অনেক আকাম-কুকাম মার্কা সিলেবাস প্রমাণ করা হয় এবং এই সিলেবাস গুলি মূলত হিন্দুত্ববাদী শক্তির এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য পরিকল্পনা ছিল

আওয়ামী লীগ এদেশের মুসলিম নেতাদের নাম মুছে ফেলার জন্য হিন্দুত্ববাদীদের এজেন্ডার মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছিল । এদেশের মুসলিম নেতা যেমন সলিমুল্লাহ সাহেব, সৈয়দ আহমদ উনাদের নাম মুছে ফেলার জন্য সব সময় সদা প্রচেষ্ট থাকত । কারণ উনাদের নাম যদি মুসলমান ছেলেদের মাথায় ঢুকে তাহলে হিন্দুত্ববাদীদের এজেন্ডা সহজে বাস্তবায়ন হবে না

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছিল যেখান হতে দেশ পরিচালনা করার উপযুক্ত লোক তৈরি না হতে পারে। হিন্দুত্ববাদীদের উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশে মেধাবী তৈরি না হলে ভারত হতে মেধা আমদানি করে দেশকে পরিচালনা করা ।সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা বরবাদ করে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বরবাদ করার জন্য পাঁয়তারা করেছিল। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হল আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ডের প্রধান হিসেবে একজন হিন্দুকে নিয়োগ দেয়া।

এছাড়া হাসিনার আমলে ধর্মীয় মূল্যবোধের বিপরীতে হাইস্কুলে যৌন শিক্ষা নামক একটি বিষয় চালু করেছিল যা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চরিত্র বরবাদ করার সহায়ক ছিল ।শিক্ষার কারিকুলামে এমন বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করেছিল যা পৌত্তলিক সংস্কৃতির ধারক বাহক ছিল। এদিকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা বরবাদ করে মেধাহীন জাতিতে পরিণত করা , অপরদিকে ধর্মীয় মূল্যবোধহীন শিক্ষা ব্যবস্থা বরবাদ করে একটি অসভ্য জাতিতে পরিণত করার গভীর চক্রান্তে লিপ্ত ছিল।

হাসিনা সরকার এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বরবাদ করেছে। ইসলামী শিক্ষাকে নির্বাসনে পাঠায় । তাই শিক্ষা ব্যবস্থার বরবাদ রোধ কল্পে জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতাঃ- পর্ব ১০
বিষয়ঃ- বিচার ব্যাবস্থার পতন রোধকল্পে জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক, বিচার বিভাগ কোন একটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা এবং রাষ্ট্রের ভিতরে শান্তি বজায় রাখতে বিচার বিভাগের ভুমিকা অসামান্য।
কারণ বিচার বিভাগ যদি ন্যায় বিচার না করে তাহলে দেশের জনগণের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হবে।

পাঠক, আওয়ামী লীগ সব সময় বিচার বিভাগকে নিজের কুক্ষিগত করে যথেচ্ছাভাবে বিচারের রায় প্রদান করে । হাসিনার আমলে বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমন করা

হয় । হাসিনার অবৈধ আদেশ পালন করতে করতে বিচার বিভাগ হাঁফিয়ে উঠেছিল। বিচারের বাণী এই সময়ে নীরবে কেঁদেছে। হাসিনা কর্তৃক নিয়োজিত বিচারপতিগণ দ্বারা আইনজীবীদের নিগৃহীত হওয়ার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসার পর তারা প্রহসনের বিচার শুরু করে । তারা তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের নামে দেশের সৎ এবং দেশপ্রেমিক লোকদেরকে বিচারের নামে ফাঁসিতে ঝুলায় ।

এছাড়া আওয়ামী লীগ বিচার বিভাগের যে কোন স্তরেই অর্থাৎ সর্বস্তরে তাদের লোক বসিয়ে রেখেছিল যাতে কোন মুসলিম শক্তি বা ইসলামী শক্তি কখনো বিচার বিভাগ থেকে ন্যায়বিচার না পাই । উচ্চ আদালত সহ নিম্ন আদালত সব জায়গায় ছিল হিন্দুত্ববাদের ধারক বাহকদের জয়জয়কার।

প্রহসনের বিচার ছিল হাসিনা সরকারের অন্যতম মূল নীতি। বেগম খালেদা জিয়াকে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে জেল দেয়া হয়েছিল । প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে খালেদা জিয়াকে অবরুদ্ধ করে দেশকে ভারতের তাঁবেদার বানানো ছিল হিন্দুত্ববাদী হাসিনার অন্যতম এজেন্ডা।

বিচার ব্যবস্থা একটি দেশের ন্যায় বিচারের মানদণ্ড। হাসিনা প্রহসনের বিচার করে বহু লোককে জুডিশিয়াল কিলিং করেছে । হাসিনা তার শাসনামলে মুসলমানদেরকে শায়েস্তা করতে গায়েবি মামলার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক মুসলমানদেরকে হয়রানি করা হয়েছে।

নিম্ন আদালত হতে উচ্চ আদালত সর্বত্রই ছিল হিন্দুত্ববাদীদের দৌড়াত্ব । হিন্দুত্ববাদী সরকার বিচার বিভাগকে প্রভাবিত করে মুসলমানদেরকে দমন পীড়ন করে।

বিচার বিভাগের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে দেশকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দেয়। এজন্য ভারত পন্থী বিচারপতিদের ব্যবহার করা হয়েছে।

হাসিনার শাসন আমলে ভারতীয় বিচারপতিগণ দ্বারা এদেশের বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কাজেই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য জুলাই বিপ্লব আবশ্যক ছিল।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতাঃ- পর্ব ১১

বিষয :- মুখোশধারী ও চেতনা ব্যবসায়ীদের কবল থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষায় জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক , আওয়ামী লীগ একটি মুখোশ ধারী ও চেতনা ব্যবসায়ী দল । এই মুখোশধারী ও চেতনা ব্যবসায়ীদের কবল হতে মুসলমানদেরকে রক্ষার জন্য জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য ।

আওয়ামী লীগ তার জন্ম লগ্ন থেকেই মুখোশধারী একটি দল । ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ যখন প্রতিষ্ঠা হয়

, তখন এর নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। আবার প্রতিষ্ঠার সময় এই দলের গঠনতন্ত্রে বলা ছিল যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়েছে।

মুসলিম ও খিলাফত শব্দটি দেখে সাধারণ মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করে। ফলে ধর্মীয় জিকিরের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদেরকে তাদের দলে ভিড়িয়ে অবশেষে ১৯৫৩ সালে মুসলিম নামটি পরিত্যাগ করে আওয়ামী লীগ নাম ধারণ করে।এভাবে আওয়ামী লীগ প্রথমে মুসলিম নামটি পরিত্যাগ করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে।

পাঠক, আওয়ামী লীগ তার জন্ম লগ্ন হতেই ভারতের সেবা দাস হিসেবে কাজ করে আসছে। এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে মুসলিম ও খিলাফত শব্দটি ব্যবহার করে ধোঁকাবাজির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে তাদের পতাকা তলে সমবেত করে।

দ্বিতীয়ত ধাপে আওয়ামী লীগ জনগণের অধিকারের কথা বলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্বী করে অথাৎ যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনে বিজয় লাভ করে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং মুসলিম জাতিসত্তার বিপরীতে বাংগালী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হয়ে উঠে। ১৯৭১ সালের পর তারা স্ব গোত্রীয় হাজার হাজার নেতাকর্মীদের হত্যা করে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের আগে হাসিনা ও তার দলবল ধর্মীয় লেবাস ধারন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় এসে অগ্নি শিখা নামক পৌত্তলিকতার জন্ম দেয়। অবশেষে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

এই দলটি সব সময় চেতনা ব্যবসায়ী এবং মুখোশদারী এবং সব সময় চেতনা ব্যবসার মাধ্যমে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয় । চেতনার নামে ইসলাম ও মুসলমানদের দমন করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই ভারতের সেবাদাস এই দলটিকে উৎখাত করার জন্য জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা:- পর্ব ১২
বিষয় :-প্রশাসনিক ব্যাবস্থা পূনরুদ্বারের জন্য আবশ্যিকতা ।

পাঠক, একটি দেশের উন্নতি ও স্থিতিশীলতার জন্য প্রশাসনের গুরুত্ব অপরিহার্য। কোন দেশের প্রশাসন কোন দলের অথবা ব্যাক্তির আজ্ঞাবহ হতে পারে না। প্রশাসন যদি কোন দল অথবা ব্যাক্তির আজ্ঞাবহ হয়, তখন দেশে মারাত্মক স্কট দেখা দেয়। একটি দেশের প্রশাসন হল দেশের হতপিন্ড।
এই প্রশাসন যদি কোন ব্যক্তি বা দলের আজ্ঞাবহ হয় , তাহলে দেশের আভ্যন্তরীণ চেইন অভ কমান্ড বরবাদ হয়ে যায়। হাসিনা তার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রশাসনের সর্বস্তরে ভারতের এজেন্ট অথবা ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়নে জন্য লোক নিয়োগ দেয় ।

প্রশাসনে থাকা মুসলিম জাতিসত্তার লোকদেরকে নজরদারিতে রাখত এবং তাদেরকে নায্য অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মুসলিম জাতিসত্তার কর্ম চারী ও কর্মকর্তারা সব সময় আত্েক থাকত যে, কোন সময় তাদের চাকরি চলে যায় অথবা পানিশমেন্ট পোষ্টি্ হয় ।

প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়ে ঢুকলে মনে হত এটি কোন মুসলিম রিয়াসাত নয় , বরং একটি হিন্দু রাষ্ট্র। কারণ গুরুত্বপূর্ণ অধিকাংশ পদে হিন্দুদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। মুসলিম কর্মচারী ও কর্মকর্তারা ছিল কোন ঠাসা। প্রশাসনের সর্বত্র মুসলিম জাতিসত্তায় বিশ্বাসী কর্ম চারী ও কর্মকর্তাদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করত।

দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ বাহিনী দ্বারা জনগণের মধ্যে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। যেখানে পুলিশ বাহিনী জনগণকে সহায়তা করার জন্য বাধ্য, সেখানে এই পুলিশ বাহিনী জনগণকে গোলাম হিসেবে গন্য করত। পুলিশ বাহিনীতে ভারতীয় এজেন্ট ব্যতিত কাউকে পদায়ন অথবা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হত না। জনগণ ভয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারত না। পুলিশ বাহিনী জনগণকে সেবার পরিবর্তে ভারতের সেবা করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

এমতাবস্থায় প্রশাসনের সর্বস্তরে ভারতীয় এজেন্টদের বিতাড়ন করে দেশ প্রেমিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে জুলাই বিপ্লব ছিল অপরিহার্য।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা:- পর্ব ১৩
বিষয় :- রাষ্ট্রে পৌত্তলিক বিশ্বাস রোধের জন্য জুলাই বিপ্লবের জন্য আবশ্যিকতা ।

পাঠক, একটি মুসলিম রিয়াসাতে পৌত্তলিকতার উৎসাহিত করা গর্হিত অপরাধ, কারণ মুসলিম দেশ পরিচালিত হয় মুসলমানদের করের টাকায় এমতাবস্থায় যদি কোন মুসলিম দল বা কোন শাসক পৌত্তলিকতাকে উৎসাহিত করে সে অবশ্যই মুসলমানদের সাথে গাদ্দারি করল। আওয়ামী লীগ সব সময় পৌত্তলিকতাকে উৎসাহিত করে।

পাঠক, এই সেই আওয়ামী লীগ যে একটু সুযোগ পেলেই বা্গালী জাতীয়তাবাদের নামে পৌত্তলিকতাকে

উৎসাহিত করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কে ভাষা মিনার করে সেখানে ফুল দেয়ার মাধ্যমে পৌত্তলিকতাকে উৎসাহিত করে।

পাঠক, অতঃপর ১৯৯৬ সালে তারা বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসে অগ্নি শিখা নামক অগ্নিপূজা শুরু করে। এই সময় মাওলানা আজিজুল হক সাহেব এই অগ্নি শিখার বিরুদ্ধে হুংকার দিলে হাসিনা সরকার অগ্নি পূজা বন্ধ করতে বাধ্য হয় ।

অতঃপর এই ২০০৯ সালে হাসিনা সরকার বাংলাদেশ ক্ষমতায় আসার পর তার পিতার মূর্তিতে সারা দেশ সয়লাব করে ফেলেছিল । এই মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে মাওলানা মামুনুল হক হুংকার দিলে তাকে মিথ্যা মামলায় হাজতে প্রেরণ করে ।

আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতারাই ছিল পৌত্তলিক সংস্কৃতির ধারক বাহক। তাদের নেতারা এমন বক্তব্য দিয়েছে যে, অনেক সময় তাদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে সংশয় তৈরি হত। এমনি ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় তারা সব সময় পৌত্তলিকতাকে উৎসাহিত করত ।

এমতাবস্থায় এদেশের মুসলমানদেরকে পৌত্তলিকতা হতে মুক্তির জন্য জুলাই বিপ্লব আবশ্যক ছিল।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা:- পর্ব ১৪
বিষয় :- অখন্ড ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন ভূলুণ্ঠিত করার জন্য জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা ।

পাঠক, ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তি সবসময়ই হিন্দুত্ববাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে বিভোর । এই হিন্দুত্ববাদী শক্তি মুসলমানদেরকে গোলাম বানিয়ে অথবা মুসলমানদেরকে সমূলে বিনাশ করে রাম রাজত্ব কায়েম করার জন্য অখন্ড ভারতের প্রবক্তা হইয়াছে ।
১৯৪৭ সালের পর হইতেই এই হিন্দুত্ববাদী শক্তি পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং ১৯৭১ সালে সেই ষড়যন্ত্র সফলতা লাভ করে । অতঃপর যখনই আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ক্ষমতার মসনদে আরোহন করে তখনই এই হিন্দুত্ববাদে শক্তি বাংলাদেশকে প্রথমে গ্রাস করে রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালায় ।

অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুত্ববাদী শক্তি আওয়ামী লীগের পাশাপাশি তাদের নিজস্ব বাহিনী বাংলাদেশের মোতায়ন করে , যেমন ইসকন সহ আরো বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে এগুলি অখণ্ড ভারতের বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর ।

এই অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা হিন্দুত্ববাদীদের স্বপ্নের আশা পূরণে হাসিনা সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করে । এই হাসিনা সরকার হিন্দুত্ববাদীদের এমন সুবিধা নিয়ে যা সে দেয়নি ।

এমনকি হাসিনা পতনের কয়েক দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। একটি মুসলিম রিয়াসাতে মুসলিম বিরোধী রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত গাওয়ার ইতিহাস নেই। ভারতীয় জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ হয়ে যায় যে, ভারত এদেশকে তাদের গোলাম মনে করে এবং গোলাম হিসেবে ঘোষণা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ ছিল নেহেরু ডকট্রিন বাস্তবায়নের হাতিয়ার।

অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষাকে ধ্বংস করা, নৈতিকতা শূন্যে নিয়ে যাওয়া, জেনারেল শিক্ষাতে দুর্বল scripts দেয়া, চাকরির বাজার বৃদ্ধি না করে কথিত বিসিএস এর প্রতি মোহ তৈরি করে খুবই সূক্ষ্মভাবে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে ভারত। এতে করে দেশের বেকারত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে নৈতিকতা শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে। ঐদিকে সিস্টেমে দেশের মধ্যে মাদক ছড়িয়ে দিয়ে দেশের যুব সমাজকে শারীরিক ভাবে, মানসিকভাবে ভেঙে দিয়েছে। এই সবই সূক্ষ্ম ব্রেইনের খেলা খেলছে ভারত এবং মায়ানমার মিলে। ভারতের উদ্দেশ্যে ছিল ধীরে ধীরে এদেশকে অখন্ড ভারতের অংশ করা। এমতাবস্থায় অখন্ড ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন ভূলুণ্ঠিত করার জন্য জুলাই বিপ্লবের আবশ্যক ছিল।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতাঃ- পর্ব ১৫

বিষয় ঃ- কুরআন ও সুন্নাহর শাসন প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করার জন্য জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা।

পাঠক , আওয়ামী লীগ বরাবর একটি ইসলামবিদ্বেষী এবং মুসলিমবিদ্বেষী শক্তি । তারা প্রথমেই মুসলমানদের সাথে দোঁকায় লিপ্ত হয়েছে ১৯৪৯ সালে যখন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করে। তখন আওয়ামী লীগ শব্দের সাথে আওয়ামী মুসলিম লীগ শব্দটি ছিল ।এই আওয়ামী মুসলিম লীগের শব্দের ব্যানারে বেশ কিছু সরল মুসলমান এই তাদের পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার পর তারা একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। অতঃপর এই দল মুসলিম শব্দকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ শব্দ ধারণ করে । কোন মুসলিম দেশে সেকুলারিজম বা সমাজতন্ত্রের নামে কোন দল থাকলে সেই দল অবশ্যই নিষিদ্ধ করা আবশ্যক , কারণ এই সেকুলারিজম এবং কমিউনিস্ট গুলি মুসলমানদের অস্তিত্বকে বিলীন করার জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা লিপ্ত থাকে এবং কমিউনিস্ট গুলি অন্য দেশের দালাল হয়ে মুসলমানদের মধ্যে হানাহানি সৃষ্টি করে ।

একজন মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহর আইন চাইতে পারে, এটি তার অধিকার। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী আওয়ামী লীগ মুসলমানদের অধিকার কেড়ে নেয়।
আওয়ামী লীগ ১৯৭২ সালে ক্ষমতায় এসে সমস্ত ধর্মভিত্তিক দল নিষেধ করে এমনকি । ২০২৪ সালে ধর্মীয় দল জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করে। এছাড়া অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর উপর কঠিন ছিল।

জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা:- পর্ব ১৬
বিষয় :- মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য জুলাই বিপ্লবের আবশ্যিকতা

পাঠক , আওয়ামী লীগ কখনো মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশ্বাসী নয় । ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ এ দেশের ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন সব পত্রিকা কে নিষিদ্ধ করে তাদের অনুগত মাত্র চারটা পত্রিকার ডিক্লারেশন জারি রাখে অর্থাৎ আওয়ামী লীগের অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে যাতে কোনদিন কেউ মত প্রকাশ করতে না পারে সেজন্য তারা সবসময় সদা সচেষ্ট ছিল

সব দেশেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ।

পাঠক, এই হিন্দুত্ববাদী শাসকগোষ্ঠী যখন এই দেশের ক্ষমতায় আসে তখন মুসলমানদের উপর পৃথিবীতে যদি কোন আজাব গজব বা অত্যাচার হয় সে অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ করার সুযোগ থাকে না , উদাহরণস্বরূপ ২০২০ সালে যখন কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী শক্তি অত্যাচার শুরু করে এবং তাদের অধিকার কেড়ে নিয়ে তখন বাংলাদেশের মুসলমানরা বায়তুল মোকাররম সমবেত হয়ে এর প্রতিবাদ জানাতে চাইলে তৎকালীন পুলিশের প্রধান বেঞ্জির মিয়া কাশ্মীরি মুসলমানদের পক্ষে কোন প্রতিবাদ সভা বা মিছিল করা যাবে না মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয় ।এই হল আওয়ামী লীগের আমলের মুসলমানদের অবস্থা। এই আওয়ামী লীগের আমলের মত প্রকাশের স্বাধীনতা অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী শক্তি আওয়ামী লীগকে ধরে বসেছিল এবং এই হিন্দুত্ববাদীদের গোলামী করার জন্য মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়ে গেছে।